হুমায়ূন আহমেদ

এক্সকেলে

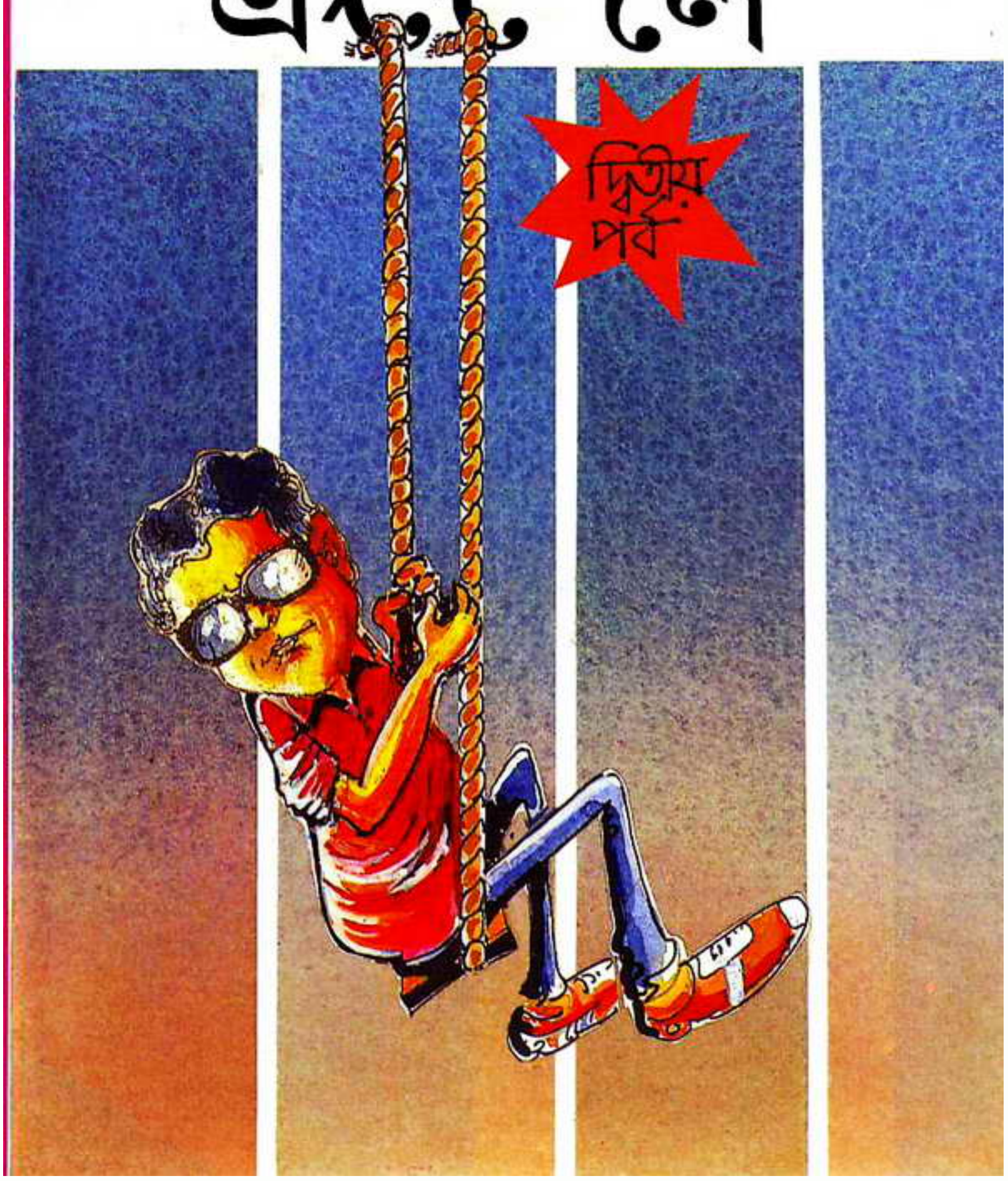

প্রথম সংস্করণের ভূমিকা

এলেবেলে দ্বিতীয় পর্বের লেখাগুলি এর আগে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়নি। তবে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় পৃথক পৃথক ভাবে লেখাগুলি ছাপা হয়েছে। লেখাগুলি খবরের কাগজ, উন্মাদ, কিছু মিছু, বিচিত্রা ইত্যাদি ম্যাগাজিনে ছাপা হয়েছিল। এছাড়া সর্বশেষে লেখকের একটি ব্যাঙ্গাত্মক রচনা সংকলিত করা হয়েছে।

প্রকাশক

দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকা

কবি নির্মলেন্দু গুণের ইলেকশন ক্যাম্পেন করতে গিয়ে যে অভিজ্ঞতা হয়েছিল তার গল্প এই সংস্করণে ঢুকিয়ে দিলাম। সদ্য সমাপ্ত ধারাবাহিক নাটক অয়োময় প্রসঙ্গে একটি লেখা আছে। প্রথম সংস্করণে প্রচুর ছাপায় ভুল ছিল সেগুলি ঠিক করা হয়েছে তবে অন্য জায়গায় আবারো ভুল করা হয়েছে। এটাই স্বাভাবিক কারণ গ্রন্থের নামই হল 'এলেবেলে'!

হুমায়ূন আহমেদ
১.০১.৯২
শহীদুল্লাহ্ হল, ঢাকা।

সিদ্দিকুর রহমান খন্দকার বিরস মুখে বসে আছেন।

মন খারাপ হলেই তাঁর টক ঢেকুর ওঠে। সন্ধ্যা থেকে তাই উঠছে। এক ঘণ্টার মধ্যে কুড়িটা ঢেকুর ওঠে গেছে। ঘণ্টায় কুড়িটা হিসেবে ঢেকুর ওঠার মত কারণ ঘটেছে। ইলেকশনে তাঁর মার্কা পড়েছে কুমীর। এত কিছু থাকতে তাঁর ভাগ্যে পড়ল কুমীর? এই কুৎসিত প্রাণী মানুষের কোন উপকারে আসে বলে তো তিনি জানেন না। ভোটাররা কুমীরের নাম শুনলেই পিছিয়ে যাবে। তিনি কল্পনায় পরিষ্কার দেখছেন, লোকে বলাবলি করছে খাল কেটে কুমীর আনবেন না। সিদ্দিককে ভোট দেবেন না।

এতদূর এসে পিছিয়ে পড়াটা ঠিক হবে কি-না তাও বুঝতে পারছেন না। টাকা খরচ হচ্ছে জলের মত। সব সংগঠনকে টাকা দিতে হচ্ছে। কেউ যেন বেজার না হয়। টাকা দিতে হচ্ছে হাসিমুখে গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে। টাকাও যে আদর করে দিতে হয় আগে জানতেন না। কত অদ্ভুত সংগঠন যে বের হচ্ছে। আজ সকালে চাঁদা চাইতে একদল আসল। তিনি হাসিমুখে বললেন,

'বাবারা, তোমাদের সমিতির নাম কি?'

'বিবিসি শ্রবণ সমিতি।'

'সেটা আবার কি?'

'আমরা দল বেঁধে বিবিসি'র খবর শুনি। তারপর সেই খবর বিশ্লেষণ করি।'

'ভাল। ভাল। অতি উত্তম। বিবিসি শুনবেনা তো কি শুনবে?'

'আমাদের রেডিও কি আর শোনার উপায় আছে? এই নাও বাবারা পঁচিশ টাকা।'

দলের প্রধান এমন ভাব করল যে সে খুবই অপমানিত হয়েছে। মুখ বেঁকিয়ে বলল, স্যার বুঝি ভিক্ষা দিচ্ছেন?

'আরে না, ভিক্ষা কেন দিব।'

'একটা শর্ট ওয়েভ রেডিওর দাম খুব কম হলেও দু হাজার। শর্ট ওয়েভ রেডিও ছাড়া আমরা বিবিসি শুনব কিভাবে?'

'তা তো বটেই, যুক্তিসংগত কথা। আচ্ছা দু'হাজারই নাও — আমার দিকে একটু খেয়াল রাখবে।'

তা তো রাখবোই। প্রতীক কি পেয়েছেন খবর দিবেন। আমরা বিবিসি শ্রবণ সমিতি আপনার পেছনে আছি। দলের প্রধান দু'হাজার টাকা হাতে পেয়ে চেঁচিয়ে ওঠল, 'সিদ্দিকুর রহমান খোন্দকার'। বাকি সবাই এক সঙ্গে চেঁচাল — 'দূর হবে অন্ধকার'।

এইসব শুনতে ভাল লাগে। খুবই ভাল লাগে। কিন্তু টাকা যে হারে যাচ্ছে তাতে মনে হচ্ছে দিন সাতেক পর আর কিছুই ভাল লাগবে না। তার উপর মার্কা হল কুমীর। কোন মানে হয়?

সিদ্দিক সাহেবের পাশে তাঁর নির্বাচনী উপদেষ্টা পরিষদের প্রধান মুখলেস সাহেব বসে আছেন। অতি বিচক্ষণ ব্যক্তি। সিদ্দিক সাহেবকে ভাজিয়ে ভাজিয়ে ইলেকশনে দাঁড়া করানোর বুদ্ধিও তাঁর। মুখলেস সাহেব স্থানীয় হোমিওপ্যাথ ডাক্তার। তাঁর ডাক্তারখানাই সিদ্দিক সাহেবের নির্বাচনী অফিস। কুমীর প্রতীকের খবর স্থানীয় জনগণকে পৌঁছে দেবার জন্যে মুখলেস সাহেব কিছুক্ষণ আগে একটা রিকশা মিছিল বের করেছেন। পঁচিশটা রিকশা। একটার পেছনে একটা যাচ্ছে। প্রথম রিকশা থেকে একজন চেঁচিয়ে বলছে, খবর আছে?

পেছনের প্রতিটি রিকশায় দু'জন করে কর্মী বসা। তাঁরা চেঁচিয়ে বলছে, আছে।

'কি খবর?'

'কুমীর।'

'কার কুমীর?'

'সিদ্দিক সাহেবের কুমীর।'

কুমীর প্রতীকের খবর শহরে ছড়িয়ে দেবার দায়িত্ব শেষ করে মুখলেস সাহেব ফার্মেসীতে এসে বসলেন। সিদ্দিকুর রহমান আগে থেকেই সেখানে আছেন। তাঁর মুখের বিরস ভাব তিনগুণ বেড়েছে, কারণ কিছুক্ষণ আগে ভয়েস অব আমেরিকা শ্রবণ সমিতিও দু'হাজার টাকা নিয়ে গেছে, শ্রবণ সমিতির খবর প্রচার হলে — আরো সব সমিতি তৈরি হবে। 'আকাশবাণী শ্রবণ সমিতি,' 'রেডিও শ্রীলংকা শ্রবণ সমিতি . . .'

মুখলেস সাহেব চায়ের কাপ হাতে সিদ্দিক সাহেবের পাশে বসতে বসতে

বললেন, কুমীর মার্কা পাওয়ায় আমাদের খুবই সুবিধা হয়েছে। যাকে বলে শাপে বর।

সিদ্দিক সাহেব মরা মরা গলায় বললেন, কেন?

'নতুন ধরনের ক্যাম্পেইন করব। "ভোট দিবেন কিসে? কুমীর মার্কা বাক্সে" জাতীয় ফাজলামী না। নতুন স্টাইল। আমরা জীবন্ত কুমীর নিয়ে আসব।

'জীবন্ত কুমীর?'

'হ্যাঁ জীবন্ত কুমীর। নির্বাচনী প্রচার হবে জ্যান্ত কুমীর দিয়ে। পাঁচমণি দুই কুমীর থাকবে মিছিলের সামনে। পাবলিক কুমীর দেখে ট্যারা হয়ে যাবে। বাঙ্গালী হচ্ছে হুজুগের জাত। এই হুজুগে সব ভোট চলে যাবে কুমীরের বাক্সে।'

'কুমীর পাবে কোথায়?'

'ঢাকার চিড়িয়াখানা থেকে ভাড়া নিয়ে আসব।'

সিদ্দিক সাহেব বিস্মিত হয়ে বললেন, 'ওরা কুমীর ভাড়া দেয় না-কি?'

'জানি না। না দেওয়ার তো কোন কারণ নেই। চেষ্টা করে দেখতে হবে। আমি নিজেই যাব। না পাওয়া গেলে সুন্দরবনের খাল থেকে কুমীর ধরা হবে। টাকা খরচ হবে — উপায় কি?'

'কত লাগবে?"

'কুমীর প্রতি পনেরো হাজার ধরুন। দুটায় ত্রিশ প্লাস ক্যারিং কস্ট। ট্রাকে করে তো আর আনা যাবে না — পানির ট্যাংকে করে আনতে হবে। আমাদের ইলেকশনে পাশ-ফেল নির্ভর করছে কুমীরের উপর। জ্যান্ত কুমীর চলে এলে কর্মীদের মধ্যেও উৎসাহের জোয়ার চলে আসবে।'

'কথাটা ভুল বলনি।'

সিদ্দিক সাহেবের মুখ থেকে মন খারাপের ভাব অনেকখানি দূর হয়ে গেল। মুখলেস সাহেব পঁয়ত্রিশ হাজার টাকা নিয়ে ভোরের ট্রেনে ঢাকা চলে গেলেন। পৌঁছেই আর্জেন্ট টেলিগ্রাম করলেন — "'Send more money.''

টাকা পাঠিয়ে দেয়া হল। দ্বিতীয় টেলিগ্রাম (আর্জেন্ট) চলে এল, ''Artist coming. Crocodiles follow''. এই টেলিগ্রামের অর্থ সিদ্দিক সাহেব কিছুই বুঝলেন না। Artist coming মানে কি? হওয়া উচিত Crocodile coming. স্থানীয় কলেজের ইংরেজীর অধ্যাপককে অর্থ উদ্ধারের জন্য দেয়া হল। তিনিও কিছুই বুঝলেন না তবু হাসতে হাসতে বললেন, সামান্য জিনিস বুঝতে পারছেন না? কুমীর আসবে খুব আর্টিস্টিক ভঙ্গিতে। মানে কায়দা-কানুন করে আনা হচ্ছে আর কি। হা-হা-হা। সামান্য ইংরেজী লোকজন বুঝতে পারে না — So sad. বড়ই দুঃখজনক।

টেলিগ্রামের অর্থ পরিষ্কার হওয়ামাত্র সিদ্দিক সাহেবের বাসার সামনের মাঠ খুঁড়ে পুকুরের মত করা হল। সাইনবোর্ডে লেখা হল —

সাবধান! সাবধান! সাবধান! জলে কুমীর আছে। গোসল, কাপড় কাচা নিষিদ্ধ।

কুমীর এল না, তবে মুখলেস সাহেবের চিঠি নিয়ে জীনসের প্যান্ট এবং আউলা-ঝাউলা চুল নিয়ে এক লোক উপস্থিত। চিঠিতে লেখা —

"টেলিগ্রামে পাঠানো বার্তা অনুযায়ী আর্টিস্ট পাঠালাম। সে কুমীরের ছবি এঁকে চারদিকে ছয়লাপ করে দেবে। তাকে যত্নে রাখবেন। গাঁজা না খেয়ে সে ছবি আঁকতে পারে না। ঐ দিকেও লক্ষ রাখবেন। এ দিকে কুমীরের খবর হল, ঢাকা

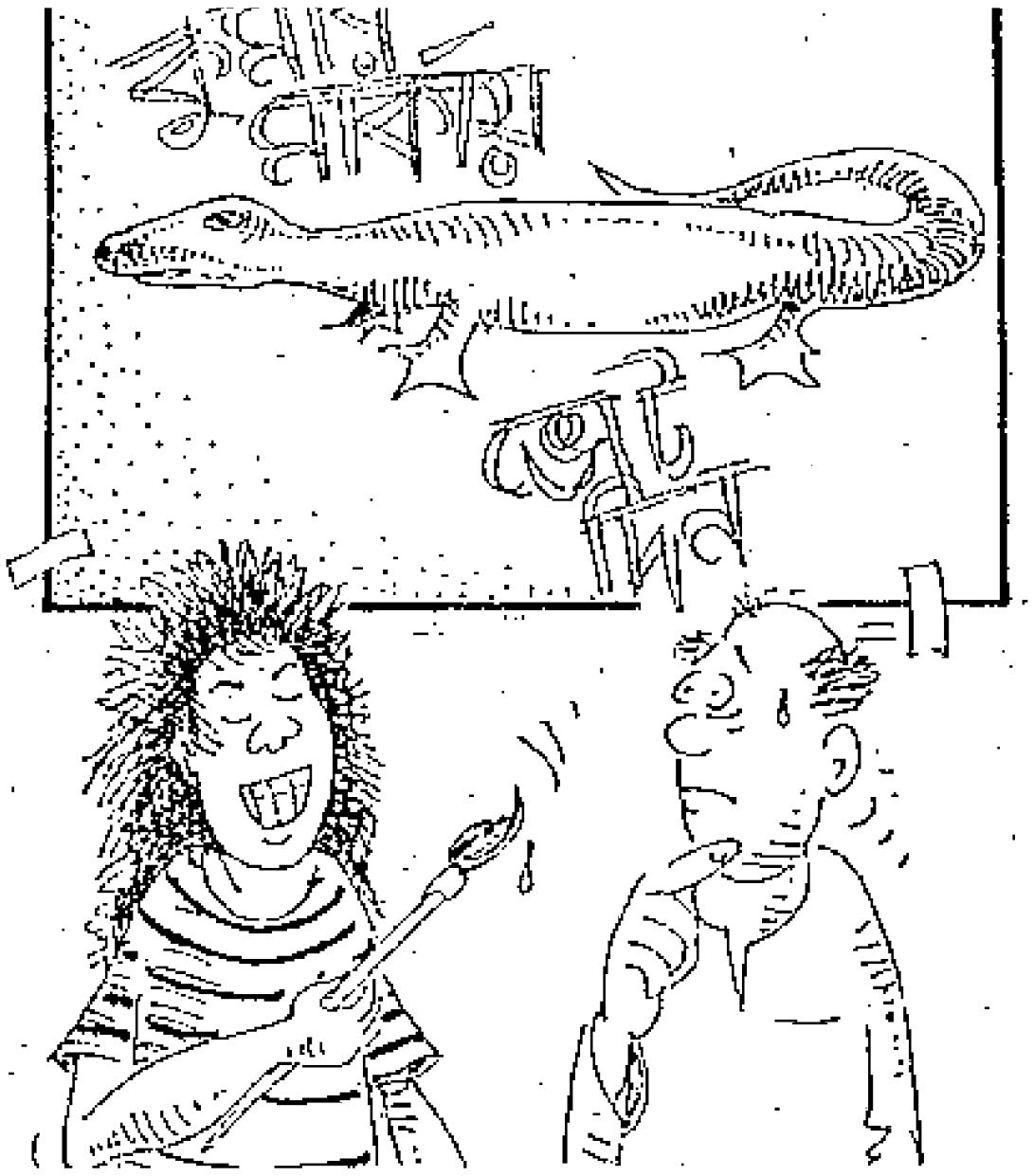

চিড়িয়াখানা কর্তৃপক্ষ কুমীর ভাড়া দিতে রাজী নন। আমি অদ্য ভোরে খুলনা রওনা হচ্ছি। সরাসরি কুমীর ধরা ছাড়া অন্য পথ দেখছি না। ঠিক করেছি, সরাসরি যখন ধরতেই হচ্ছে — দু'টা না ধরে গোটা দশেক ধরে নিয়ে আসব। কুমীর ধরার কাজে সহায়তা করার জন্যে প্রাণীবিদ্যায় M.Sc (দ্বিতীয় শ্রেণী, সপ্তম স্থান) একজন ছাত্রকে নিযুক্ত করেছি। তার নাম আবুল কালাম। বেতন মাসিক চার হাজার। এই সঙ্গে 'বিপদ ভাতা' দু'হাজার।

আপনি পত্র পাওয়ামাত্র নিচের ঠিকানায় আরো কুড়ি হাজার পাঠিয়ে দেবেন। মনে সাহস রাখবেন। আমাদের বিজয় নিশ্চিত। জয় কুমীর।"

আর্টিস্ট পঞ্চাশ টাকার গাঁজা এবং তিন প্যাকেট স্টার সিগারেট খেয়ে বিশাল এক কুমীর এঁকে ফেলল। সিদ্দিক সাহেব হতভম্ব হয়ে বললেন, লাল রঙের কুমীর? কুমীর কি লাল হয়?

আর্টিস্ট বিরক্ত মুখে বললেন, লাল না — এটা মেজেন্টা কালার।

'কুমীর কি মেজেন্টা কালারের হয়?'

'হয় না — ইচ্ছা করেই মেজেন্টা করে দিলাম। দূর থেকে চোখে পড়বে রাগী কুমীর।'

'রাগী কুমীর মানে — আমি কি রাগী?'

আর্টিস্ট থমথমে গলায় বললেন, কি যন্ত্রণা! আপনি কি কুমীর না-কি? আপনার মার্কা কুমীর। আপনার মনের মিল রেখে কুমীর আঁকতে হলে তো কুচকুচে কালো রঙের কুমীর আঁকতে হয়।

সিদ্দিক সাহেব অনেক কষ্টে রাগ সামলে বললেন, কুমীরের লেজ থাকে বলে জানতাম। এটার লেজ কোথায়?

'লেজ আছে। লেজটা বেঁকিয়ে শরীরের পেছনে রেখেছে বলে আপনি দেখতে পাচ্ছেন না।'

'লেজটা বেঁকিয়ে শরীরের পেছনে কেন রাখল জানতে পারি?'

'অবশ্যই জানতে পারেন। কাগজ কম পড়ে গেল। পোস্টার বোর্ড আরো বড় হলে চমৎকার লেজ দিয়ে দিতাম।'

কুমীরের বিশাল ছবি সিদ্দিক সাহেবের নির্বাচনী অফিসের সামনে টানিয়ে দেয়া হল। সিদ্দিক সাহেব তৎক্ষণাৎ আর্টিস্টকে ডেকে পাঠালেন। রাগী গলায় বললেন, 'লোকে বলছে কুমীরটা দেখতে টিকটিকির মত হয়েছে।'

আর্টিস্ট হাসিমুখে বললেন — ঠিকই বলছে।

'ঠিকই বলছে মানে?'

মন দিয়ে শুনুন — ছবি কি ভাবে আঁকতে হয় আপনাকে বুঝিয়ে বলছি। একটা মডেল সামনে রাখতে হয়। সেই মডেল দেখে দেখে আঁকতে হয়। আমার সামনে কোন মডেল ছিল না — টিকটিকি দেখে এঁকেছি। এখন বুঝলেন? আসল কুমীর দেখে যখন ছবি আঁকব তখন বুঝবেন কুমীর কাকে বলে। স্যার, গাঁজার পরিমাণ বাড়াতে হবে। পঞ্চাশ টাকার গাঁজায় কিছুই হয় না।

সিদ্দিক সাহেব বললেন, দয়া করে আর ছবি আঁকবেন না। কুমীর আসুক। কুমীর দেখে যা আঁকার আঁকবেন।

'নো প্রবলেম।'

নির্বাচনী প্রচারেও ভাটা পড়ে গেল। কুমীর এলে জোরে সোরে শুরু হবে এই অবস্থা। মুখলেস সাহেব বাগেরহাট থেকে টেলিগ্রাম পাঠালেন —

''Good News. Coming with fifty crocodiles.''

চারদিকে হৈ হৈ শুরু হয়ে গেল। সন্ধ্যাবেলা সিদ্দিক সাহেবের বাসায় থানার ওসি এসে উপস্থিত।

'সিদ্দিক সাহেব, এসব কি শুনছি?'

'কি শুনছেন?'

'পঞ্চাশটা কুমীর না-কি আনছেন?'

'ঠিকই শুনেছেন। নির্বাচনী কাজে আনা হচ্ছে। কাজ হলে সুন্দরবনে ছেড়ে দিয়ে আসা হবে।'

'নির্বাচনী নীতিমালা লংঘন করছেন। কুমীর আপনি আনতে পারেন না।'

'অবশ্যই পারি। কোন আইনে আছে যে নির্বাচনে কুমীর ব্যবহার করা যাবে না?'

ওসি সাহেব অনেক ঘাঁটাঘাটি করেও নির্বাচনী নীতিমালায় এমন কোন আইন খুঁজে পেলেন না। তবে শহরে ঘোষণা দিয়ে দিলেন — কুমীরদের কাছ থেকে সবাই যেন দূরে থাকেন। তিনি জেলা শহরে কুমীর বাহিনী শান্তি রক্ষার জন্যে বাড়তি পুলিশ চেয়ে পাঠালেন। সারা শহরে হৈ চৈ পড়ে গেল।

পুরো ব্যাপারটায় উৎসাহী হয়ে সিদ্দিক সাহেব মুখলেসকে জরুরী টেলিগ্রাম পাঠিয়ে লিখলেন — "সম্ভব হলে একশ কুমীর নিয়ে এসো। আরো কুড়ি হাজার টাকা পাঠালাম। জয় কুমীর।"

আমার ধারণা, উন্মাদের পাঠক–পাঠিকারা আমার এই রচনা পড়ে আমার উপর যথেষ্ট পরিমাণে ক্ষিপ্ত হয়েছেন। তাঁদের কাছে অত্যন্ত বিনয়ের সঙ্গে নিবেদন করছি ঘটনা সবই সত্য। কুমীর প্রতীকে নির্বাচন করেছেন কবি নির্মলেন্দু গুণ। আমার উপর দায়িত্ব ছিল ঢাকা চিড়িয়াখানা থেকে কুমীর নিয়ে যাওয়ার। আমি যথাসময়ে কয়েকটা মাটির কুমীর নিয়ে উপস্থিত হই। কবি গুণের জামানত বাজেয়াপ্ত হয়। তাঁর ধারণা, এই ভরাডুবি হয় আমার কারণে। আমি যথাসময়ে কুমীর নিয়ে এলে এই কান্ড হত না।

এর পরেও যারা আমার কথা বিশ্বাস করছেন না তাঁদের কবি গুণের বাসভূমি বারহাট্টায় যেতে বলছি। কবির পৈতৃক বাড়ির পেছনে পুকুরের কাছে এখনো সাইনবোর্ড ঝুলছে —

সাবধান! সাবধান! সাবধান!
জলে কুমীর আছে।
গোসল, কাপড় কাঁচা নিষিদ্ধ।

'ভিক্ষুকের ঘোড়া'র গল্পটা আপনাদের জানা আছে কি না বুঝতে পারছি না। যে বিষয় নিয়ে লিখতে বসেছি তার জন্যে ভিক্ষুকের ঘোড়ার গল্প জানা থাকলে ভাল হয়। গল্পটা এই রকম—

এক গ্রামে এক ভিক্ষুক ছিল। বেচারা খোঁড়া। বাড়ি বাড়ি গিয়ে ভিক্ষা করতে পারে না — বড় কষ্ট। কাজেই সে টাকা-পয়সা জমিয়ে একটা ঘোড়া কিনে ফেলল। এখন ভিক্ষা করার খুব সুবিধা। ঘোড়ায় চড়ে বাড়ি বাড়ি যায়।

এক জোছনা রাতে গ্রামের কিছু ছেলেপুলে ঠিক করল – একটা ঘোড়া দৌড়ের ব্যবস্থা করবে। পাঁচটা ঘোড়া জোগাড় হল। ডিসট্রিক্ট বোর্ডের ফাঁকা রাস্তায় ঘোড়া ছুটল। মজার ব্যাপার হচ্ছে, চারটা ঘোড়া জায়গামত এসে পৌঁছল, পঞ্চম ঘোড়ার কোন খোঁজ নেই। একেবারে লা-পাত্তা। সবাই চিন্তিত হয়ে অপেক্ষা করছে। ঘন্টা দুই পর পঞ্চম ঘোড়ার দেখা পাওয়া গেল, হেলতে দুলতে আসছে। বন্ধুরা চেঁচিয়ে উঠল, কিরে কোথায় ছিলি তুই?

ঘোড়ার উপর থেকে ক্লান্ত ও বিরক্ত গলা ভেসে এল — আর বলিস না, আমার ভাগে পড়েছে ঐ হারামজাদা ভিক্ষুকের ঘোড়া। এই ঘোড়া রাস্তায় ওঠে না — মানুষের বাড়ি বাড়ি গিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। গ্রামের যে ক'টা বাড়ি আছে সব ক'টার সামনে দাঁড়িয়ে তারপর আসলাম।

এই হচ্ছে ভিক্ষুকের ঘোড়ার গল্প। এইবার যে বিষয় নিয়ে লিখতে বসেছি সেটা বলি।

গতবারের ভয়াবহ বন্যায় এদেশের একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরা ঠিক করলেন তাঁরা কিছু করবেন। সমস্যা হতে পারে বলে বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম বলছি না। বুদ্ধিমান পাঠক, অনুমানে বুঝে নিন। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের কাজকর্মের ধারা অন্যদের মত হবে এটা আশা করা যায় না। কি করা হবে তা ঠিক করার জন্যে একটি শক্তিশালী কেন্দ্রীয় কমিটি গঠন করা হল। কমিটিকে বলা হল

'ওয়ার্কিং পেপারস' তৈরী করতে। সেই কমিটি আবার তিনটি সাব-কমিটি করল সেই সাব-কমিটিগুলোর আহ্বায়ক কে হবেন তা নিয়ে জটিলতার সৃষ্টি হল জটিলতা কমাবার জন্যে আরো একটি উপকমিটি তৈরী হল। পাঁচ ছ'টি মিটিংয়ের পর কেন্দ্রীয় কমিটি পরিকল্পনা দাখিল — বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরা নিজেরাই একটি ত্রাণকেন্দ্র খুলবেন এবং পরিচালনা করবেন।

সেই ত্রাণকেন্দ্র অন্যসব ত্রাণকেন্দ্রের মত হবে না। নুতন ধরনের হবে। যারা এই ত্রাণ কেন্দ্রে আশ্রয় নেবে তাদের অক্ষরজ্ঞানের ব্যবস্থা করে দেয়া হবে। ত্রাণকেন্দ্র ছেড়ে এরা যখন বাড়ি ফিরবে তখন তারা লিখতে এবং পড়তে জানবে। ত্রাণশিবিরে তাদের রাখা হবে মোট ২৫ দিন। প্রতিদিন তাদের দু'টি করে অক্ষর শেখালেই হবে।

জ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গে তাদের খাদ্যও দেয়া হবে। ত্রাণ ব্যবস্থায় প্রচলিত খিচুড়ি নয়। বিশ্ববিদ্যালয় ফুড এণ্ড নিউট্রিশন বিভাগের তত্ত্বাবধানে একই খরচে তৈরী খিচুড়ি যাতে শরীরের নিউট্রিশনাল ব্যালান্স ঠিক থাকে। ফুড এণ্ড নিউট্রিশন বিভাগের সভাপতির ব্যক্তিগত তত্ত্বাবধানে খিচুরির নমুনাও তৈরী হল। জিনিসটির রং হল গাঢ় সবুজ। কেন হল সেটা একটা রহস্য, কারণ কাঁচা মরিচ ছাড়া সেখানে সবুজ অন্য কিছু ছিল না। সভাপতিসহ সবাই সেই খিচুড়ি এক চামচ করে খেলেন — স্বাদ ভালই, তবে এক চামচেই প্রত্যেকের পেট নেমে গেল। কেউ তা স্বীকার করলেন না, কারণ নোংরা অসুখ নিয়ে কথা বলতে শিক্ষকরা পছন্দ করেন না।

খাওয়া-দাওয়ার থেকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার ব্যাপারে বেশী জোর দেয়া হল। প্রতি পঞ্চাশজন পুরুষের জন্যে একটি করে এবং প্রতি চল্লিশজন মহিলার জন্যে একটি করে বাথরুমের ব্যবস্থা করা হল। মহিলারা সুযোগ বেশী পেলেন, কারণ বিশ্ববিদ্যালয়ের সোসিওলজী বিভাগের একজন শিক্ষক সমীক্ষায় দেখিয়েছিলেন — মহিলারা বাথরুম বেশী ব্যবহার করেন।

পুরুষদের বাথরুমে দাড়িওয়ালা একজন পুরুষের ছবি, নীচে লেখা পুং, মেয়েদের বাথরুমে ঘোমটা পরা নব বধু, নীচে লেখা মহিলা। এই নিয়ে বাথরুম সাব কমিটিতে জটিলতা সৃষ্টি হল। বলা হল — দাড়িওয়ালা পুরুষের ছবি কেন? পুরুষমাত্রেই যে দাড়ি থাকবে তার তো কোন কথা নেই? সাইকোলজির একজন এসোসিয়েট প্রফেসর বললেন, "দাড়িওয়ালা পুরুষের ছবি বন্যার্তদের কনফিউজ করতে পারে। তারা ভাবতে পারে যাদের দাড়ি আছে শুধু তারাই এইসব বাথরুমে যাবে। এরা এমনিতেই একটা মানসিক চাপের ভেতর আছে। নতুন কোন চাপ সৃষ্টি করা উচিত হবে না।" দাড়ি সমস্যার সমাধান হল না। বিষয়টা চলে গেল কেন্দ্রীয়

কমিটিতে। সমস্যার সমাধান না হওয়া পর্যন্ত ত্রাণশিবির উদ্বোধন বন্ধ রাখা হল। অবশ্যি বন্ধ রাখার আরো কারণ আছে। উদ্বোধন কে করবেন তা নিয়েও সমস্যা। অনেকে চান ভাইস চ্যান্সেলর করবেন, আবার অনেকে ভাইস চ্যান্সেলরের নামও শুনতে চান না। তাঁদের চয়েস প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর।

ইতিমধ্যে অনেক দেরী হয়ে গেছে। বন্যার্তরা অন্যসব ত্রাণশিবিরে ঢুকে পড়েছে। তবে যেহেতু বাংলাদেশের কোন ত্রাণশিবির কখনো খালি থাকে না, এটিও খালি রইল না। শহরের যত রিকশাওয়ালা তাদের ছেলেমেয়ে এবং স্ত্রীর হাত ধরে ত্রাণ কেন্দ্রে ঢুকে পড়ল। দিনে রিকশা চালায়। রাতে এসে সাহায্য হিসেবে পাওয়া কম্বলের উপর ঘুমিয়ে থাকে। ব্যবস্থা অতি চমৎকার। পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। ডাক্তার আছে, নার্স আছে, সুন্দর বাথরুম। সবুজ রঙের খাদ্যটা একটু সমস্যা করছে, তবে

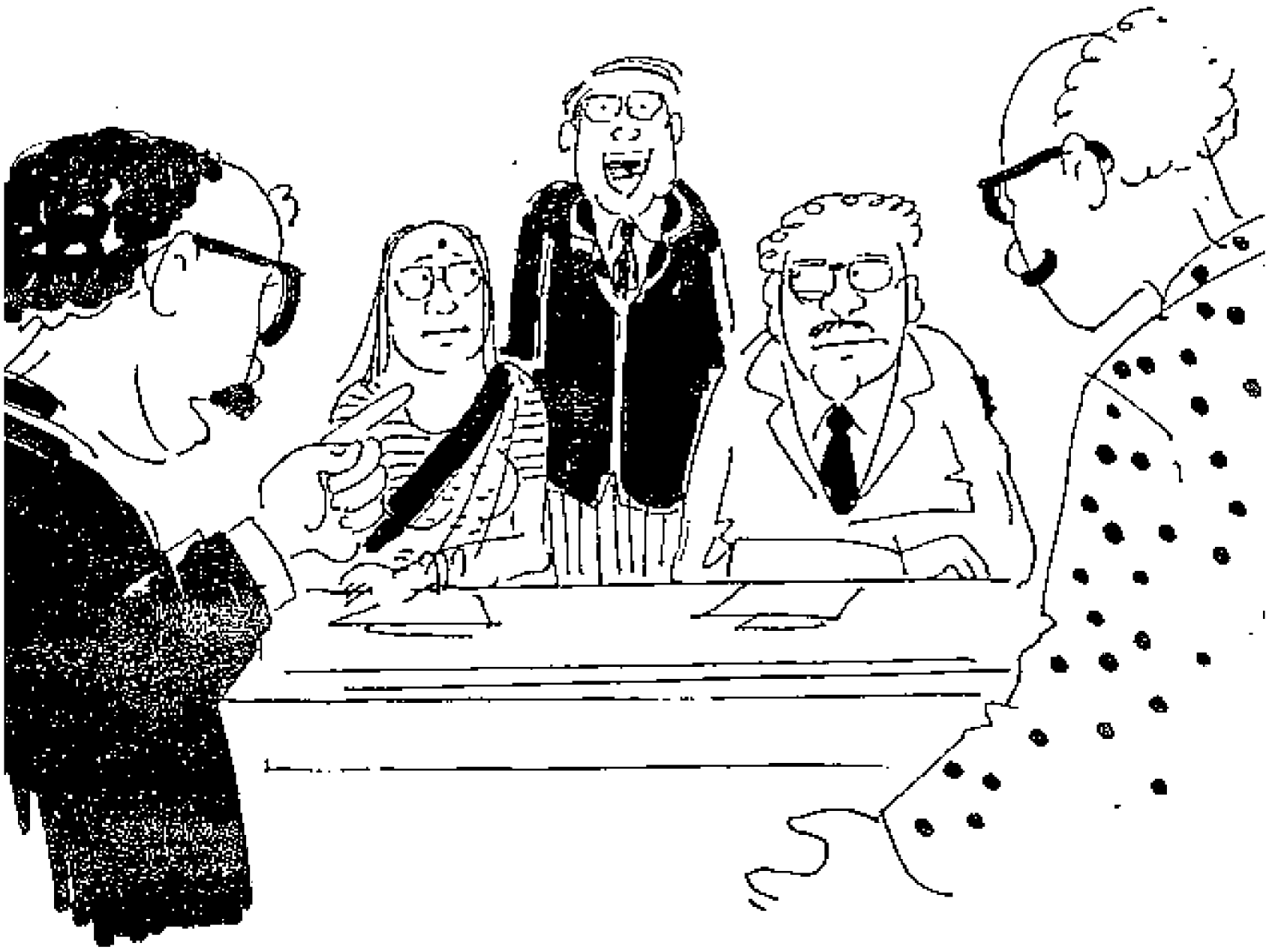

সব তো আর পাওয়া যায় না।

তৃতীয় দিন থেকে ক্লাস শুরু হল। চল্লিশজন করে একটা ক্লাসে। সকাল ন'টা থেকে দুপুর বারোটা পর্যন্ত ক্লাস। বিকেল আড়াইটা থেকে টিউটোরিয়েল। প্রতি গ্রুপে সাতজন করে। পড়ানোর কায়দাও নতুন ধরনের। ব্যঞ্জনবর্ণ দিয়ে শুরু। স্বরবর্ণগুলো ব্যঞ্জনবর্ণের সাথেই আসছে। যেমন প্রথম দিনে শেখানো হল 'ক' এবং 'কা'। সকাল ন'টা থেকে দুপুর বারটা পর্যন্ত সবাই এক নাগাড়ে পড়ছে 'ক', 'ক', 'কা', 'কা'। দ্বিতীয় দিনে 'কি', 'কি', 'কু', 'কু'।

বন্যার্তরা ব্যাপারটায় মনে হল বেশ মজা পেল। যখন ক্লাস হচ্ছে না, রাতে ঘুমুবার আয়োজন হচ্ছে তখনো দেখা গেল এরা নিজেদের মধ্যে নতুন ভাষায় কথা বলছে।

যেমন–

'কা কা কি কি কু?'

'গা গা গু গু'।

'গি গি গি?'

'খ খ খা।'

দশম দিন শিক্ষকদের উৎসাহে ভাটা পড়ে গেল। কারণ তাঁরা লক্ষ্য করলেন ছাত্ররা শুরুতে কি পড়েছে সব ভুলে বসে আছে। যখন তারা চ চ চা চা পড়ে তখন ক ক কা কা ভুলে যায়। আবার যখন ত ত তা তা পড়ে তখন চ চ চা চা ভুলে যায়।

এই স্মৃতিশক্তি বিষয়ক সমস্যার কি করা যায় তা বের করবার জন্যে মনোবিদ্যা বিভাগের সভাপতিকে আহ্বায়ক করে একটি জরুরী কমিটি গঠন করা হল এবং কমিটিকে অনতিবিলম্বে সুপারিশমালা পেশ করতে বলা হল।

সুপারিশমালা হাতে আসার আগেই অবশ্যি ত্রাণশিবির খালি হয়ে গেল। কারণ এখানে সাহায্য কিছুই পাওয়া যাচ্ছে না। শিক্ষকরা নিজেরা যা পারছেন দিচ্ছেন, বাইরের সাহায্য নিচ্ছেন না। কার দায় পড়েছে বিনা সাহায্যে কা কা কু কু করতে?

অবশ্যি পঁচাত্তর বছর বয়সের মুনশিগঞ্জের ছমির উদ্দিন মোল্লা একা ঝুলে রইলেন। বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশুনার একটা সুযোগ তিনি পেয়েছেন এই সুযোগ হারাতে রাজি নন। একটা ডিগ্রী না নিয়ে তিনি যাবেন না।

এইসব দেখে আমার ধারণা হয়েছে ভিক্ষুকদের ঘোড়ার মত আমাদের শিক্ষকদেরও একটা ঘোড়া আছে। সেই ঘোড়াও বিশেষ বিশেষ জায়গা ছাড়া যেতে পারে না।

কিছুদিন আগে আমার একটা তিক্ত অভিজ্ঞতা হয়েছে। আমার সব অভিজ্ঞতাই তিক্ত, তবে এই অভিজ্ঞতাটা একটু বেশী রকম তিক্ত। সন্ধ্যাবেলা টিভির সামনে বসামাত্র টেলিফোন এল। অতি মিষ্টি গলায় এক তরুণী বলল, আপনি কি আমাদের বাসায় একটু আসবেন? তরুণীদের মিষ্টি গলায় আমি সচরাচর বিভ্রান্ত হই না। অভিজ্ঞতায় দেখেছি মিষ্টি গলার তরুণীরা সাধারণত মৈনাক পর্বতের মত বিশাল হয়। যে যত মোটা তার গলা তত চিকণ।

এই ক্ষেত্রে বিভ্রান্ত হলাম। মেয়েটির গলা শুনে মন কেমন করতে লাগল। সে গলায় এক কেজি পরিমাণ মধু ঢেলে বলল, প্লীজ, আমাদের বাসায় কি একটু আসবেন? প্লীজ! প্লীজ!

আমি প্রায় বলেই ফেলেছিলাম, অবশ্যই। শেষ মুহূর্তে নিজেকে সামলালাম। আগ বাড়িয়ে আগ্রহ দেখানো ঠিক না। মেয়েদের চরিত্রের একটা বিশেষ দিক হল যেই মুহূর্তে তারা অপর পক্ষের আগ্রহ টের পায় সেই মুহূর্তে নিজেরা দপ করে নিভে যায়। কাজেই আমার পক্ষ থেকে কোন রকম আগ্রহ দেখানো ঠিক হবে না। তাছাড়া একালের তরুণীরা অনেক রকমের ফাজলামি জানে। এটাও বিচিত্র কোন ফাজলামির অংশ কিনা কে জানে?

আমি অবহেলার ভঙ্গিতে বললাম, ব্যপারটা কি? তরুণী মধুর স্বরে বলল, আমার বড় চাচাকে একটু হাসাতে হবে।

আমি বিস্মিত হয়ে বললাম, তার মানে?

ঃ উনার হার্ট এ্যাটাক হয়েছে। এখন রেস্টে আছেন। খুব মনমরা। আপনি এসে উনাকে একটু হাসিয়ে দিয়ে যান। প্লীজ।

আমি রাগ করব কি না বুঝতে পারলামনা। তার বড় চাচাকে হাসাবার জন্যে আমাকে যেতে হবে কেন? আমি কি গোপাল ভাঁড়? উন্মাদে কয়েকটা এলেবেলে লেখার এই কি পুরস্কার?

ঃ প্লীজ, আসুন। প্লীজ।

তরুণীর কণ্ঠের কাতর আহ্বান মুনী ঋষিরাও ঠেলতে পারেন না। আমি হচ্ছি একজন এলেবেলে লেখক। তবু চট করে রাজি হওয়াটা ভাল দেখায় না। আমি অনিচ্ছার একটা ভঙ্গি করে বললাম, বাসা কোথায় তোমাদের?

ঃ আপনি আসছেন। সত্যি আসছেন? ইশ কি যে খুশী হয়েছি। এত আনন্দ হচ্ছে। জানেন, আমার চোখে পানি এসে গেছে।

আমার মধ্যে খানিকটা দ্বিধার ভাব ছিল। তরুণীর এই কথায় সমস্ত দ্বিধা দূর হয়ে গেল। রাত আটটার দিকে কলাবাগানের এক বাসায় উপস্থিত হলাম। উপস্থিত হওয়া মাত্র আবিষ্কার করলাম মিষ্টি গলার ঐ তরুণীর বয়স দশ । সে আজিমপুর গার্লস স্কুলে ক্লাস সিক্সে পড়ে।

তরুণীর বাবা অবশ্যি বার বার বলতে লাগলেন, আমার মত বিশিষ্ট ভদ্রলোক তিনি দেখেননি। তাঁর বাচ্চা মেয়ের কথায় এত রাতে চলে এসেছি। এই যুগে এ জাতীয় ভদ্রতা খুবই বিরল ইত্যাদি।

আমার জন্যে চা বিস্কুট এল। ভদ্রলোক বললেন, যান ভাই আমার বড় ভাইয়ের সঙ্গে দেখা করে আসুন। আপনার সঙ্গে কথা বললে তিনি খুবই খুশী হবেন।

তাঁর বড় ভাইয়ের সঙ্গে দেখা হল। মনে হল না যে তিনি খুব আহ্লাদ লাভ করলেন। বিরস মুখে বললেন, এত রাতে আমার কাছে কি ব্যাপার?

ক্লাস সিক্সে পড়া মেয়ে হড় বড় করে বলল, চাচা উনি খুব মজার লোক। উনার সঙ্গে কথা বললে হাসতে হাসতে তোমার পেট ফেটে যাবে। উনি হাসির নাটক লেখেন।

হাসির নাটক লিখি শুনে ভদ্রলোক মনে হল আরো বিরক্ত হলেন। বিড় বিড় করে বললেন, যখন চাবুক মারা নাটক দরকার তখন লেখা হয় হাসির নাটক। এই দেশের হবে কি?

এই জাতীয় মানুষদের খুশী করার একমাত্র উপায় হল তাঁদের সবকথায় একমত হওয়া। আমি অতি দ্রুত তাঁর সব কথায় একমত হতে লাগলাম। তিনি যখন বললেন, এইখানকার ডাক্তাররা হার্টের ব্যাপারে কিছুই জানেন না। আমি বললাম, যথার্থ বলেছেন। কিছুই জানেনা।

তিনি বললেন, এই দেশের ইন্টেলেকচুয়েল শ্রেণীকে জেলখানায় আটক রাখা উচিত। আমি সেই প্রস্তাবেও খুব সহজে রাজি হয়ে গেলাম।

ভদ্রলোক বললেন, এই দেশে কোন ভদ্রলোক বাস করতে পারে না। আমি

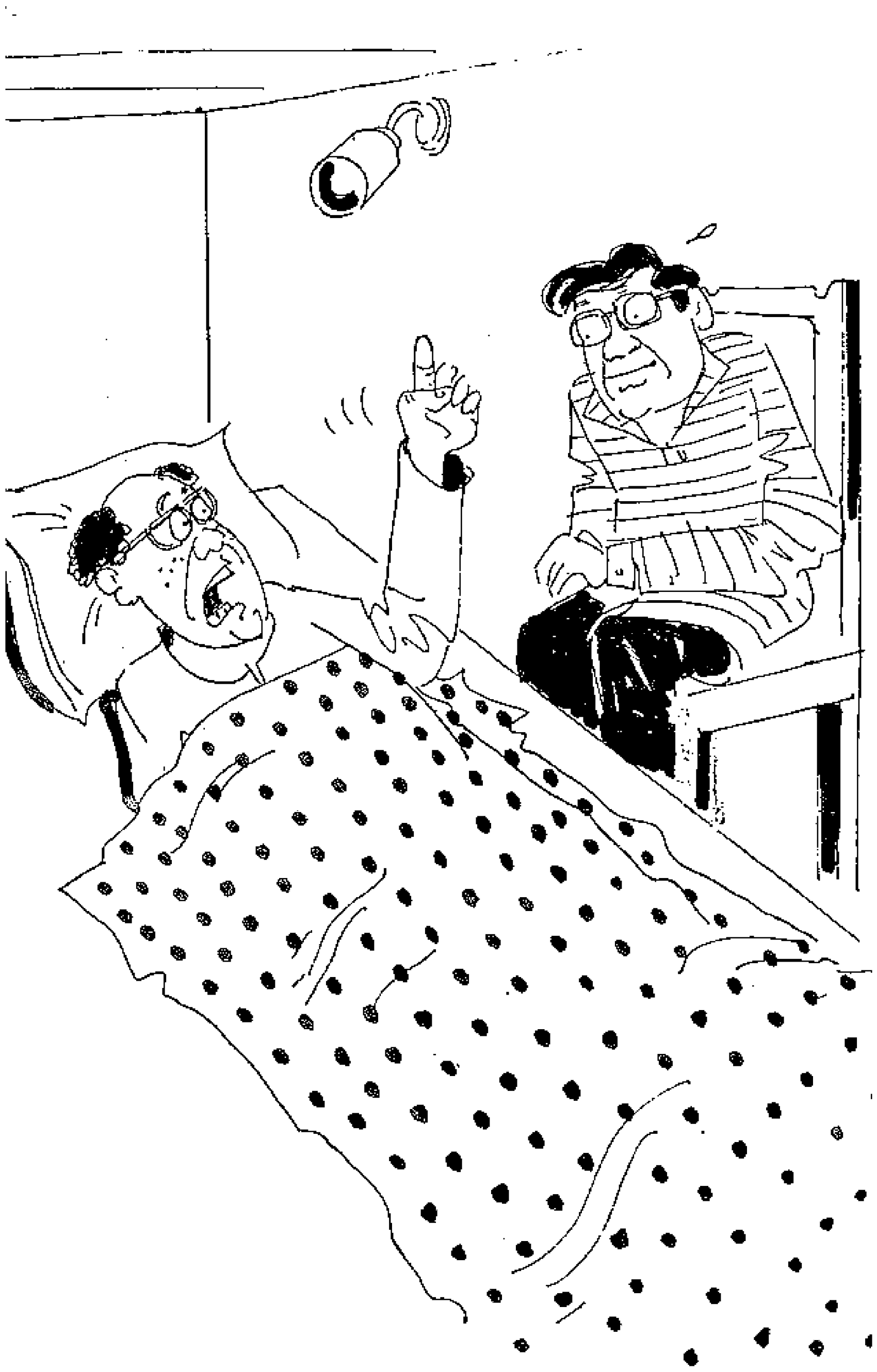

বললাম, অবশ্যই।

ঃ লোকজন হাসে, গল্প করে, আনন্দ করে। দেখে আমার গা জ্বলে যায় গত তিন মাসে আমি একবারও হাসিনি। কেউ আমাকে হাসাতে পারে না।

সিল্কে পড়া মেয়েটি বলল, উনি পারবেন। উনি হাসির একটা গল্প বললেই তুমি হাসতে হাসতে কুটি কুটি হবে বড় চাচা। ভদ্রলোক কঠিন চোখে আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, আপনি আমাকে হাসাতে পারবেন?

ঃ বুঝতে পারছি না । তবে এক–আধটা গল্প বলে চেষ্টা করতে পারি।

ঃ বেশ শুরু করুন । দেখি আপনার ক্ষমতা।

আমি বেশ অস্বস্তি নিয়েই শুরু করলাম। গল্প বলে হাসাব এ রকম চ্যালেঞ্জ নিয়ে গল্প করা যায় না।

গল্পটা এক হার্টের রুগীকে নিয়ে।

"ডাক্তার হার্টের রুগীকে বললেন — সিঁড়ি দিয়ে উঠানামা আপনার জন্য পুরোপুরি নিষিদ্ধ। দুমাস আপনি সিঁড়ি ভাঙ্গতে পারবেন না।

দু'মাস পর রুগী আবার এল ডাক্তারের কাছে। ডাক্তার বললেন, হ্যাঁ, এইবার সিঁড়ি দিয়ে উঠানামা করতে পারেন।

রুগী স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বলল, বাঁচালেন ডাক্তার সাহেব। পানির পাইপ বেয়ে উঠানামা যে কি কষ্ট তা এই দু'মাসে হাড়ে হাড়ে টের পেয়েছি।"

গল্প শেষ হওয়া মাত্র ভদ্রলোক হাসতে হাসতে ভেঙ্গে পড়লেন। আমি তৃপ্তির নিঃশ্বাস ফেলে ভাবলাম, যাক বাঁচা গেল। চলে যাবার জন্যে উঠে দাঁড়িয়েছি তখন ভদ্রলোক হাসি থামিয়ে বললেন, হার্ট এ্যাটাক হবার পর এই গল্প আমি খুব কম হলেও পনেরো জনের কাছে শুনেছি। এর মধ্যে হাসির কি আছে বলুন তো? হার্টের রুগী পানির পাইপ বেয়ে উঠবে কি করে বলুন? আপনার একবার হার্ট এ্যাটাক হোক তখন বুঝবেন ব্যাপারটা কি? হেসেছি কেন জানতে চান? হেসেছি কারণ আপনি এই রাতের বেলা আমাকে হাসাবার জন্যে কষ্ট করে এসেছেন। এটা হচ্ছে ভদ্রতা।

বিদায় নিয়ে চলে আসছি। ভদ্রলোক বললেন, লোক হাসানোর কাজটা ছেড়ে দিন। মানুষকে রাগিয়ে দেয়ার চেষ্টা করুন। এই দেশের জন্যে এখন দরকার কিছু রাগী মানুষ।

মন খারাপ করে বাসায় ফিরলাম। তবে ভদ্রলোকের কথা একেবারে উড়িয়ে দিতে পারলাম না। ভাবছি আগামী এলেবেলেতে মানুষকে রাগিয়ে দেবার একটা চেষ্টা চালালে কেমন হয়?

কিছু কিছু জিনিসের প্রতি আমার এলার্জি আছে। আঁতেল বাবা মার পুত্র কন্যারা হচ্ছে সেই সব জিনিসের একটি। আঁতেল সহ্য করা যায় কিন্তু তাদের অফ– স্প্রীং অসহনীয়। এই সব অফ–স্প্রীং জ্ঞানী জ্ঞানী আবহাওয়ায় থেকে কেমন যেন ভ্যাবদা মেরে যায়। বুদ্ধি শুদ্ধি নতুন লাইনে চলে। সেই লাইন ভয়াবহ লাইন।

উদাহরণ দেই। উদাহরণটা একটু স্থূল ধরণের। সূক্ষ্ম রুচির পাঠকরা দয়া করে ক্ষমা করে দেবেন। এক সন্ধ্যায় জনৈক প্রথম সারির আঁতেলের বাসায় কিছুক্ষণ ছিলাম। এই কিছুক্ষণেই তিনি তাঁর জ্ঞান বুদ্ধি ও বিশ্লেষণ দিয়ে আমাকে অভিভূত করে ফেললেন। আমি প্রথম জানলাম যে জীবনানন্দ দাশের সব বিখ্যাত কবিতাই ইংরেজী কবিতা থেকে নেয়া। বিভূতিভূষণের সাহিত্য কোন সাহিত্যই নয় এক ধরনের রূপকথা . . .ইত্যাদি। আলোচনা যখন মায়াকোভস্কিতে চলে এসেছে তখন রঙ্গমঞ্চে আঁতেলের পুত্রের আবির্ভাব ঘটল।

পুত্রের বয়স পাঁচ ছ। সম্পূর্ণ দিগম্বর। মুখ ভর্তি হাসি। আমি তার দিকে তাকিয়ে বললাম, কি খবর খোকা? খোকা সঙ্গে সঙ্গে বলল, 'হাইগা আইলাম'।

আতেঁল ভদ্রলোক স্তম্ভিত। তিনি পুত্রের দিকে তাকিয়ে বললেন — অরূপ, যাও ভেতরে যাও।

অরূপ বলল, 'আমি হাইগা আইলাম।'

ভেতরে যাও বলছি।

অরূপ আবার সেই ভয়াবহ বাক্যটি উচ্চারণ করল।

আঁতেল রাগে প্রায় কাঁপতে লাগলেন। তাঁর মুখে কথা জড়িয়ে যেতে লাগল। আমি বললাম, বাদ দিন ছেলেমানুষ। মায়াকোভস্কি সম্পর্কে কি যেন বলছিলেন?

ভদ্রলোক কর্কশ গলায় তাঁর কাজের মেয়েটিকে ডাকতে লাগলেন। সেই মেয়ে এসে অরূপকে ধরে ভেতরে নিয়ে যাবার পর ভদ্রলোক খানিকটা শান্ত

হলেন এবং কপালের ঘাম মুছে বললেন, শিশুদের সাইকোলজি খুব অদ্ভুত, কি বলেন?

তাতো বটেই।

শিশুরা কোন কাজ করতে পারে না। কাজেই বাথরুম করাটাকে তারা মনে করে বিরাট একটা কাজ। তারা মনে করে এই কাজের খবর সবাইকে জানিয়ে দেয়া উচিত। সে তখন তাই করে। অনেকটা মুরগীর ডিম পাড়ার মত।

আমি বললাম — চমৎকার বলেছেন। কারেক্ট।

ভদ্রলোক বললেন, আপনি ডঃ মেয়ারের লেখা শিশু সাইকোলজির অসাধারণ বই 'রাইজ অব দি রিজনিং' সম্ভবত পড়েননি। সেখানে ডঃ মেয়ার দেখিয়েছেন –

ভদ্রলোক কথা শেষ করবার আগেই অরূপ আবার ঢুকল। এবার তার পরনে প্যান্ট। টুকটুকে লাল রঙের একটা শার্ট।

ভদ্রলোক ছেলেকে দেখেই অত্যন্ত গম্ভীর হয়ে গেলেন। খড়খড়ে গলায় বললেন, এখানে কি চাই?

অরূপ বলল, 'হাগা নিয়া আসলাম।'

বলেই প্যান্টের পকেটে হাত দিল। সম্ভবত প্যান্টের পকেটে করেই সে তার কর্মকাণ্ড নিয়ে এসেছে। আমাদের তা দেখিয়ে অবাক করে দিতে চায়। অরূপ তা করার সুযোগ পেল না। তার আগেই কাজের মেয়েটি এসে ছোঁ মেরে তাকে নিয়ে গেল।

আঁতেল ভদ্রলোক কাষ্ঠ হাসি হেসে বললেন, চাইল্ড সাইকোলজির চমৎকার নমুনা দেখলেন। অরূপের ধারণা হয়েছিল প্রথম বার তার কথা আমরা বিশ্বাস করিনি। কাজেই শুধুমাত্র আমাদের বিশ্বাস করানোর জন্য নোংরা কাজটা সে বাধ্য হয়ে করেছে। হাতে নাতে সে প্রমাণ করে দিতে চাচ্ছে। তাই না?

অবশ্যই।

এই জিনিসটা যদি গ্রোণআপদের মধ্যে থাকতো তা হলে পৃথিবীর চেহারাটাই পাল্টে যেত, তাই না?

জ্বি, তাতো বটেই।

আমরা যেন কি নিয়ে আলাপ করছিলাম?

মায়াকোভস্কি।

হ্যাঁ মায়াকোভস্কি। আপনি কি জানেন —

এতক্ষণ প্রথম সারির আঁতেলের পুত্রের গল্প বললাম। এখন শুনুন দ্বিতীয় সারির মহিলা আঁতেলের পুত্রের গল্প।

এই মহিলা সব সময় চেষ্টা করেন পুত্রের প্রতিভা যেন নানা দিকে বিকশিত হয়। ছেলে যেন নিজেই নতুন ধরনের খেলা ভেবে ভেবে বের করে এবং খেলে। একদিন সোশ্যাল ওয়ার্ক সেরে মহিলা বাসায় ফিরে জিজ্ঞেস করলেন, খোকন আজ কি খেলা খেললে?

আজ নতুন একটা খেলা খেলেছি মা।

বাহ্ চমৎকার। খেলাটার নাম কি? কি ভাবে খেললে?

খেলাটার নাম ডাক পিওন।

বাহ্ খুব ভাল — ডাক পিওন। তা কিভাবে খেললে?

তোমার ট্রাঙ্ক খুলে চিঠিগুলি প্রথম বের করেছি।

মা আঁৎকে উঠে বললেন, কোন চিঠি?

ঐযে নীল চিঠিগুলি। লাল ফিতা দিয়ে যেগুলি বাঁধা। তারপর ঐ চিঠিগুলি আশেপাশের সব বাড়িতে একটা করে দিয়ে এসেছি। এইটাই ডাক পিয়ন খেলা।

আঁতেল নয় এ একম একটা সাধারণ পরিবারের ন' বছর বয়েসী একটি মেয়ের কথা দিয়ে এবারের গল্প শেষ করি।

বাড়িতে মেহমান এসেছেন। বসার ঘরে বসে সবাই গল্প গুজব করছেন। হঠাৎ ন' বছর বয়েসী মেয়েটি বলল, কাল রাতে বাবা মা কি করেছে আমি সব দেখেছি। এখন আমি বলে দেব।

মেয়েটির বাবা-মা দুজনই আতঙ্কে নীল হয়ে গেলেন। মেয়েটির মা কাঁপা কাঁপা গলায় বললেন — যাও লক্ষী, তোমার ঘরে গিয়ে ল্যাগো দিয়ে খেল।

উহুঁ, আমি বলবই। প্রথমেই মা খুব রেগে গেল তারপর বাবা মা করে মাও তাই করে আর হাসে।

অতিথিরা বিপদ টের পেয়ে বললেন — এই গল্পটা আরেকদিন শুনব, কেমন?

উহুঁ, আমি আজই বলব। প্রথম বাবা করল কি হাতে পানি নিয়ে মার মুখে পানি ছিটিয়ে দিল। মা খুব রেগে গেল। তারপর সেও বাবার মুখে ছিটিয়ে দিল। তারপর দুজনই হাসে আর মুখে পানি ছিটায়। আমি পর্দার আড়াল থেকে সব দেখেছি।

আমাদের ময়মনসিংহের একটি প্রবচন হচ্ছে — 'সুখে থাকতে ভূতে কিলায়।' কিলায় হচ্ছে কিল+খায়; এক ধরনের সন্ধি যেখানে একটা অক্ষর হাওয়ায় মিলিয়ে যায়। মধ্য অক্ষরলোপী সন্ধি বলতে পারেন।

মধ্য অক্ষর লোপী সন্ধির ব্যাপারটা আমার জীবনে ঘটল। সুখে ছিলাম হঠাৎ ভূতের কিল খেলাম — রাম কিল। মনস্থীর করে ফেললাম ভ্রমণে যাব। হাতের কাছে সমুদ্র, ঠিক হল সমুদ্র–দর্শন করা হবে। আমার তিন কন্যা আনন্দে লাফাতে লাগল। আমার স্ত্রী রাগে লাফাতে লাগলেন (আমার যে কোন সিদ্ধান্তের শুরুতে তার খানিকটা রাগ হয়। সেই রাগ সময়ের সঙ্গে চক্রবৃদ্ধি হারে বাড়তে থাকে)। সমুদ্র দর্শনে তার রাগের কারণ হচ্ছে লোকজন কোলকাতা, দিল্লী, ব্যাংকক কত জায়গায় যায় আর আমরা কিনা কক্সবাজার।

এটা আবার কি রকম ভ্রমণ? ভ্রমণের মূল আনন্দ হচ্ছে শপিং। কক্সবাজার থেকে কিনবটা কি? ঝিনুকের মালা?

প্রথম শ্রেণীর যুক্তি। আমি দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেললাম। ঠিক তখন ভূতের হাতে দ্বিতীয়বার কিল খেলাম অর্থাৎ পরিকল্পনা বদলে করলাম নেপাল। হিমালয় কন্যা নেপাল — অন্নপূর্ণা, কাঞ্চনজংঘা ইত্যাদি। তিন কন্যা আনন্দে চেঁচাতে লাগল — নেপাল, নেপাল। আমার স্ত্রী রাগে লাফাতে লাগলেন।

ঃ এই শীতে কেউ নেপালে যায়? তোমার মাথাটা কি পুরোপুরি খারাপ হয়ে গেছে? এখন নেপাল যাওয়া মানেতো শীতে জমে যাওয়া।

আমি ক্ষীণ স্বরে বললাম, আমরা তো আর এভারেষ্টের চূড়ায় উঠবো না। হোটেলে থাকবো।

ঃ হোটেলেই যদি সারাক্ষণ বসে থাকতে হয় তাহলে ঢাকার হোটেলগুলি দোষ করল কি? রুম ভাড়া করে চল ঢাকার কোন একটা হোটেলে উঠে যাই।

আমি বহুব্রীহি নাটকের মামার মত গলায় বললাম, ডিসিসন ইজ ফাইনাল। তোমার যেতে ইচ্ছে হলে যাবে। ইচ্ছে না হলে যাবে না।

যখন সব পুরোপুরি ঠিক করা হল তখন পরামর্শদাতা বন্ধুদের আবির্ভাব ঘটতে লাগল। তাদের অদ্ভুত অদ্ভুত সব পরামর্শ। এবং মজার ব্যাপার হচ্ছে যার পরামর্শ যত অদ্ভুত হয় তার পরামর্শই আমার স্ত্রীর তত পছন্দ হয়। একজন এসে বলল –

সার্ক টিকিট করে ফেল। তিনটা দেশ দেখা হবে। টাকাও লাগবে কম।

ঃ কত কম?

বন্ধু টাকার অংক বলল। আমার ভিমরি খাবার অবস্থা। দল বল পুটলা পুটলি নিয়ে তিনটা দেশে যাব কেন? আমি কি যাযাবর নাকি? আমি আমার সিদ্ধান্তে অটল রইলাম — নেপাল। শুধুই নেপাল। অন্য কোথাও নয়।

একদিন বাসায় ফিরে জানলাম, আমার স্ত্রী কাকে নিয়ে নাকি সার্ক টিকেট কিনে নিয়ে এসেছে। সঞ্চিত প্রতিটি টাকা ঐ টিকিটে বেরিয়ে গেছে। থাকা, খাওয়া, ঘুরা ফেরার বাকি টাকাটা আমাকে জোগাড় করতে হবে। আমি থমথমে গলায় বললাম — সেটা কিভাবে করব?

ঃ আমি কি করে জানি কিভাবে করবে? দেশ ভ্রমণের প্ল্যানতো আমার না, তোমার।

অধিক শোকে লোকজন পাথর হয়, আমি লোহা হয়ে গেলাম। টাকার চিন্তায় ঘুম হয় না। শেষ রাতে তন্দ্রার মত হয়, তখন ভয়াবহ দুঃস্বপ্ন দেখি। অধিকাংশ দুঃস্বপ্নই ভ্রমণ-সংক্রান্ত। যেমন পাসপোর্ট হারিয়ে গেছে কিংবা হোটেলে বাচ্চাদের রেখে ঘুরতে বের হয়েছি, হোটেলের নাম গিয়েছি ভুলে। কোন রাস্তায় হোটেল তা-ও মনে নেই।

ভ্রমণ শুরু হবার আগেই আমার তিন কেজি ওজন কমে গেল। ডান দিকের জুলপি পেকে গেল। এই ব্যাপারটা যথেষ্ট রহস্যময়। ডান দিকের জুলপির চুল সাদা হয়ে গেল বাঁ দিকেরটা হল না কেন? তা হলে কি মানুষের মস্তিস্কের ডান অংশ ভ্রমণ সংক্রান্ত জটিলতা নিয়ে ডিল করে? অন্য সময় হলে এই ব্যাপ্যারটা নিয়ে ভাবতাম, এখন ভাবতে পারছি না। কারণ ক্রমাগত টেলিফোন আসছে। সবই আমাদের আত্মীয় স্বজনদের কাছ থেকে। ভ্রমণ বিষয়ক টেলিফোন। দু একটা নমুনা দিচ্ছি।

ঃ যাচ্ছ যখন আজমীরটা ঘুরে এসো। তোমারতো ছেলে নেই। তিনটাই মেয়ে। আজমীরে গিয়ে খাস দিলে দোয়া করলে কাজ হবে। খুব গরম জায়গা যা চাওয়া যায় পাওয়া যায়। তোমার মত নাস্তিককে কিছু বলা বৃথা, তুমি বরং তোমার স্ত্রীকে টেলিফোন দাও। ওকেই বুঝিয়ে বলি।

ঃ নেপাল থেকে আমার জন্যে একটা ষ্টোন আনবে। এ্যামেথিষ্ট। বাংলায় একে বলে চন্দ্রকান্ত মনি। দেখে শুনে আনবে। ওজন যেন ছয় রতির বেশী হয়। তোমা

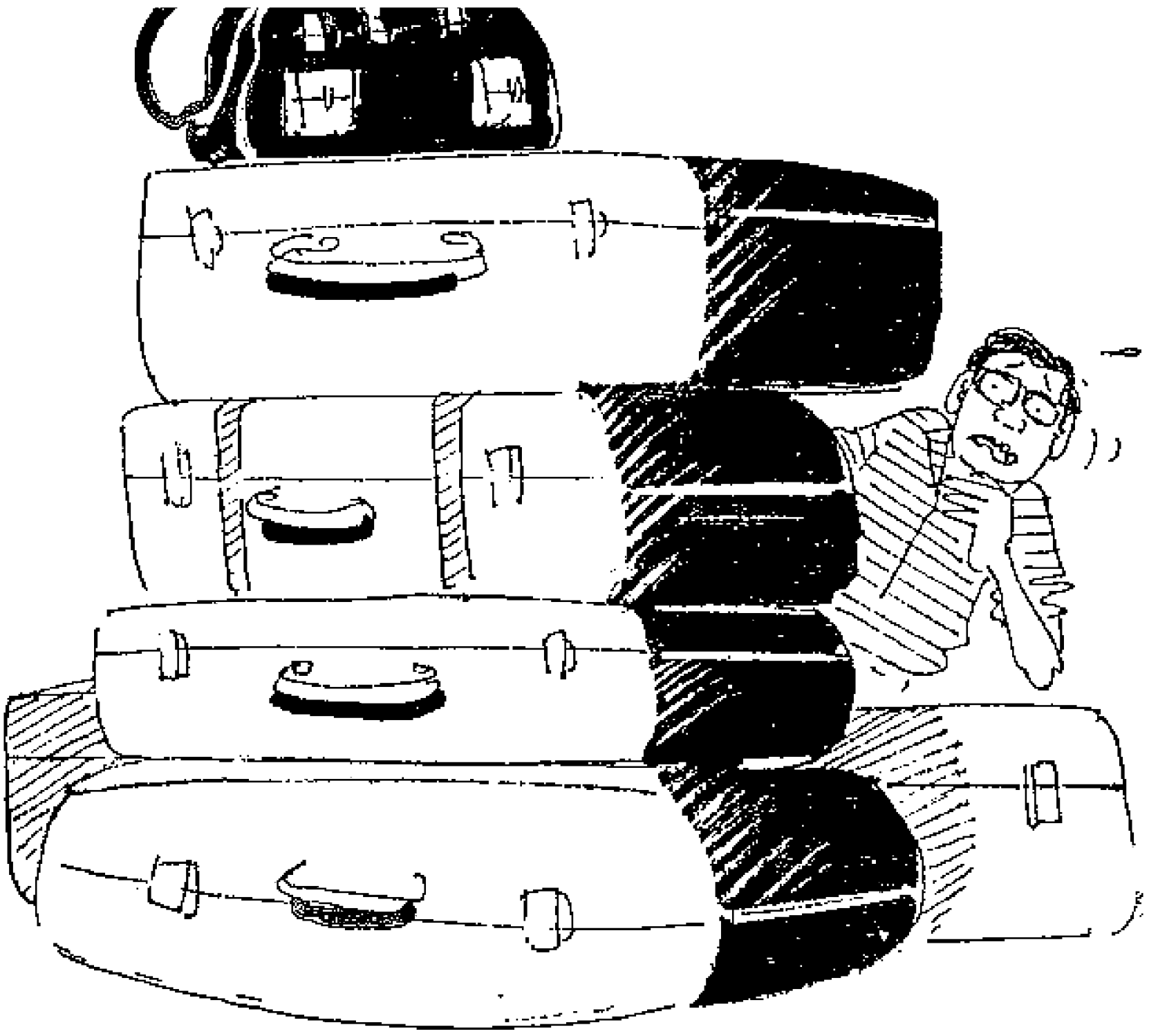

আবার আত্মসম্মানবোধ বেশী নয়ত টাকা পাঠিয়ে দিতাম।

ঃ আরে না না আমার জন্যে কিছু আনার দরকার নেই। যাচ্ছ বেড়াতে। বাজার করতে তো আর যাচ্ছ না। লাল বাবা জর্দা এক কৌটা নিয়ে এসো আর সস্তায় যদি কাজ করা শাল পাওয়া যায় তা হলে একটা আনতে পার, ঘিয়া রঙ্গ দেখে আনবে। তোমার ভাবীর বোধ হয় কি একটা ফরমাশ আছে। শাড়ি ফাড়ি হবে। মেয়ে মানুষের এই এক রোগ। নাও তোমার ভাবীর সঙ্গে কথা বল।

ঘরে ভ্রমণের প্রস্তুতি চলতে থাকে। চারটা মেক্রোসাইজ স্যুটকেস কাপড়ে ভর্তি হয়ে যায়। গোদের উপর বিষ ফোঁড়ার মত চার স্যুটকেসের সঙ্গে আছে খালি দুই স্যুটকেস। এরা যথা সময়ে ভর্তি হয়ে ফেরত আসবে, এই পরিকল্পনা। আমি একবার শুধু ক্ষীণস্বরে বলেছিলাম, এই স্যুটকেসগুলি নিতেইতো ছোটখাট একটা প্লেন দরকার। এতে আমার স্ত্রী থমথমে গলায় বললেন, — সবকিছু নিয়ে রসিকতা করবে না। জীবনটা উন্মাদের এলেবেলে নয়।

আমি চুপ করে গেলাম এবং মনে মনে বললাম — যে কবি লিখেছিলেন — 'দেখা হয় নাই চক্ষু মেলিয়া, ঘরের বাহিরে দুই পা ফেলিয়া' — তিনি যে কত সুখে ছিলেন তা তিনি জানেন না।

ঈদ প্রায় এসে গেল।

এবারের লেখাটা ঈদ নিয়েই লেখা উচিত। ঈদ নিয়ে কিছু রঙ্গ রসিকতা। তেমন ভরসা পাচ্ছি না। বহুব্রীহিতে সৈয়দ নিয়ে রসিকতা করায় এখানকার একটি পত্রিকা বলেছে আমার এবং সালমান রুশদীর চিন্তাধারায় কোন তফাৎ নেই। আমরা দুজন নাকি একই পথের পথিক।

এসব শোনার পর রসিকতা করার ইচ্ছা মোমের মত উবে যায়। এদেশের লোকজন অদ্ভুত। রসিকতা এরা কখনো রসিকতা হিসেবে নেয় না । মনে করে খুব সিরিয়াস কথা বলা হচ্ছে। আবার সিরিয়াস কথা যদি বলতে যাই তখন ভাবে রসিকতা করা হচ্ছে। এটা আমার বলার দোষও হতে পারে । এখন আমার ধারণা হচ্ছে কিভাবে রসিকতা করতে হয় এটাই বোধ হয় আমি জানি না । উদাহরণ দেই — কয়েকদিন আগে আমি আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধুকে মোটামুটি করুণ একটি গল্প বললাম। বন্ধু খুব আগ্রহ নিয়ে গল্পটি শুনল এবং গল্প শেষ হওয়া মাত্র হাসতে হাসতে ভেঙ্গে পড়ল। হাসি আর থামেই না — আমি হতভম্ব। করুণ গল্প বলছি লোকে হাসছে — আমি কি ঢাকাই ফ্লিম হয়ে গেলাম নাকি? সমস্যাটা কি? আমি আরো কয়েকজনকে গল্পটা বললাম। একই অবস্থা । যেই শুনে সেই হাসে।

আমি বরং গল্পটা বলে নেই। একজন কুখ্যাত রাজাকার ধরা পড়েছে মুক্তিবাহিনীর হাতে। ধরা পড়বার পরই সে মৃত্যু ভয়ে ভীত হয়ে পড়ল। তাকে না মারার জন্য অনেক কাকুতি মিনতি করল। কোন লাভ হল না। মুক্তিবাহিনীর কমান্ডারের নির্দেশে তাকে বাধা হল কাঁঠাল গাছের সঙ্গে। কমান্ডার তকে নিজেই গুলি করতে গেলেন । তিনি বন্দুক উঁচু করেছেন ওম্নি রাজাকারটি বলল, 'ভাইজান একটু আস্তে গুলি কইরেন।'

আমার ধারণা, এটা শুধু যে করুণ গল্প তাই না – ভয়াবহ গল্প। একজন মানুষ মৃত্যু ভয়ে ভীত হয়ে কোন পর্যায়ে চলে গেছে তা এই গল্পটি থেকে বোঝা যাচ্ছে। অথচ গল্প শুনে আমরা হাসছি। ভুলে যাচ্ছি যে সব কিছু নিয়ে রসিকতা করা যায় কিন্তু মৃত্যু নিয়ে করা যায় না। আমি নিজে অন্তত পারি না। প্রসঙ্গক্রমে মৃত্যু নিয়ে আরেকটি রসিকতা বলি। রসিকতাটা আমি শুনি একজন আইরিশ ভদ্রমহিলার মুখে আমেরিকার সানফ্রানসিসকো শহরের কফি শপে। আইরিশদের বোকামী হচ্ছে গল্পের মূল বিষয়।

একজন আমেরিকান একজন আইরিশ এবং একজন ফরাসির মৃত্যুদন্ড দেয়া হয়েছে। গিলোটিনের সাহায্যে মৃত্যুদন্ড দেয়া হবে। তিন জন দাঁড়িয়ে আছে । গিলোটিনের ধারাল ব্লেড কপিকলের সাহায্যে উঁচুতে তোলা হল। প্রথম ডাকা হল আমেরিকানকে। সে মাথা পেতে বসল। গিলোটিনের ব্লেড উঁচু থেকে ছেড়ে দেয়া হল । তীব্র গতিতে তা নেমে আসছে। আশ্চর্য কান্ড, মাঝামাঝি এসে ব্লেড থেমে গেল। আমেরিকানকে মুক্তি দেয়া হল।

একই ব্যাপার ঘটল ফরাসী লোকটির বেলায় । ব্লেড থেমে গেল মাঝপথে। ফরাসীও মুক্তি পেয়ে হাসতে হাসতে চলে গেল। সবার শেষে এল আইরিশ। গিলোটিনে মাথা পাতবার আগে সে বলল, ভাই সাহেব, সমস্যাটা কি আমি ধরতে পেরেছি। বুঝতে পেরেছি কেন গিলোটিনের ব্লেড মাঝ পথে থেমে যাচ্ছে। ঐ দেখুন এক টুকরা কাঠ মাঝ পথে বেঁধে আছে। ঐটি নামিয়ে ফেলুন দেখবেন ব্লেড কত সুন্দরভাবে নেমে আসে।

কাঠের টুকরাটি নামিয়ে ফেলা হল। আইরিশ ভদ্রলোক মাথা পেতে বসলেন। এইবার আর কোন সমস্যা হলনা । ধারাল ব্লেড শেষ পর্যন্ত নেমে এল। ভদ্রলোকের মাথা ধর থেকে আলাদা হল।

গল্প শুনে সবাই হা হা হো হো করে হাসছে। একমাত্র আমিই গম্ভীর হয়ে আছি। ভদ্রমহিলা বললেন, আপনি হাসছেন না কেন? আপনার কাছে কি গল্পটা যথেষ্ট মজার বলে মনে হয়নি?

আমি বললাম, মৃত্যু নিয়ে কোন রসিকতা আমি গ্রহণ করতে পারি না । কিছু মনে করবেন না ।

ভদ্রমহিলা খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন, মৃত্যুটাই যে বিরাট বড় একটা রসিকতা এটা কি আপনার কখনো মনে হয় না?

হালকা ধরণের কিছু কথাবার্তা বলে কিছু মিছু শেষ করব বলে ভেবেছিলাম। খন দেখছি লেখাটা ক্রমেই গম্ভীর ধরণের হয়ে যাচ্ছে।

আসলে উৎসবের আগে আগে আমার সব লেখা রসকষহীন হয়ে পড়ে বলে আমার ধারণা। যাই হোক, দুএকটা রসিকতা করে পরিবেশ হালকা করা যাক।

মিলিটারীতে 'মিলিটারী-মৌলানা' আছে তা বোধ হয় আপনারা জানেন, তারা সামরিক বাহিনীরই অংশ। এদের ওয়াজ কখনো শুনেছেন? একটু নমুনা দেই।

'ভাইসব দিলটাকে আগে পরিষ্কার করতে হবে। বন্দুক যেমন পরিষ্কার করতে হয় সেই রকম। বন্দুকের নল পরিষ্কার না থাকলে গুল্লি হয় না। সেই রকম আমাদের দিল যদি পরিষ্কার না হয় . . . '

পুলিশ-মৌলানাও আছেন যাঁরা পুলিশ বাহিনীর বেতনে প্রতিপালিত। তাঁদের ওয়াজের নমুনা —

'ভাইসব চোর ধরতে কি লাগে? বুদ্ধি লাগে। এই বুদ্ধি আমাদের কে দিল? আল্লাহ পাক। এই কথা মনে থাকা দরকার ভাইসব।'

বিশ্ববিদ্যালয়-মৌলানাও আছেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিটি হলে একজন করে মৌলানা বেতন দিয়ে রাখা হয়। তাঁদের ওয়াজ শুরু হয় পরীক্ষার উদাহরণ দিয়ে—

'ঠিকমত পড়াশোনা না করলে, বাড়ির কাজ না করলে, টিউটরিয়াল জমা না দিলে পরীক্ষা পাশ হয় না। ঠিক একই ব্যাপার আল্লাহ পাকের কাছে। যদি পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ না পড়েন, রোজা না রাখেন তাহলে আল্লাহপাকের পরীক্ষাও পাশ হবে না।'

সবশেষ রসিকতা ঈদ নিয়ে করা যাক। ভিখিরীপুত্র তার বাবাকে জিজ্ঞেস করল — বাজান ঈদ জিনিসটা কি?

বাবা উত্তর দিল, বড়লোকের আনন্দ ফুর্তির দিন।

পুত্র বলল, 'আমরার তাইলে কি?'

আমরার জইন্যেও দিনডা ভালরে ব্যাটা। এই দিনে ধনীর সাথে কোলাকুলি করণ জায়েজ আছে।

দুপুর বেলা আমাদের ছাদে একটা চোর ধরা পড়ল।

আমি খবরের কাগজ নিয়ে রোদে বসেছিলাম। ছুটির দিনে আরাম করে কাগজ পড়ব — হৈ চৈ শুনে ছাদে গেলাম।

সেখানে শিশুদের একটা জটলা। জটলার মাঝখানে সুখীসুখী চেহারার একজন লোক। গোল গোল মুখ। সুন্দর করে চুল আচড়ানো। পরনে লুঙ্গী, সাদা পাঞ্জাবী। আমাদের কাজের ছেলেটি শক্ত করে লোকটির হাত ধরে আছে এবং কিছুক্ষণ পর পর ভাঙ্গা গলায় চেঁচাচ্ছে — চোর ! কাপড় চোর !

আমাকে দেখে সেই চোর মধুর স্বরে বলল, ভাইসাব ভাল আছেন?

আমি স্তম্ভিত। বলে কি এই লোক। আমি ভাল করে তাকালাম। লোকটি পান চিবুচ্ছে। পান চিবুনোর কারণেই হয়ত লোকটির মধ্যে শান্তি শান্তি ভাব। এ রকম প্রশান্ত চেহারার কাউকে চট করে তুই বলা যায় না তবু চোরদের তুই করে বলাই নিয়ম। কাজেই আমি যথাসম্ভব কর্কশ গলায় বললাম, তুই ছাদে কি করছিস?

সে হাসি মুখে বলল, চুরি করতে আসছিলাম ভাইজান।

আমি কি বলব ভেবে পেলাম না। চোর কখনো বলে না চুরি করতে এসেছিল।

তাহলে কি এই লোকটি চোর নয়? আমি দ্বিধার মধ্যে পড়ে গিয়ে বললাম (এইবার তুমি সম্বোধনে)

ঃ কি চুরি করতে এসেছ?

ঃ শাড়ি লুঙ্গী এই সব। বাচ্চা কাচ্চার কাপড় আমি নেই না ভাইসাব।

ঃ নাও না কেন?

ঃ মার্কেট নাই।

ঃ বাড়ি কোথায় তোমার?

ঃ নেত্রকোনা, গ্রাম ধূপখালি, বারহাট্টা।

ঃ ঢাকায় থাক কোথায়?

মিরপুর দুই নম্বর সেকশন। সদর রাস্তার পাশে গ্রীন ফার্মেসী। গ্রীন ফার্মেসীর পিছনে। আমার নাম মোঃ ইসমাইল। গ্রীন ফার্মেসীতে আমার নাম জিজ্ঞেস করলে বাসা দেখায়ে দিবে।

আমি আরো ধাঁধায় পড়ে গেলাম – নাম ঠিকানা সব বলে দিচ্ছে ব্যাপারটা কি?

চোর এইবার উদাস গলায় বলল, মারধোর যা করার করে ফেলেন। বাসায় যাব।

ঃ মারধোর করব?

ঃ তাতো ভাইসাব করতেই হয়। চোর ধরলে চোররে তো কেউ চা বিস্কুট খাওয়ায় না।

এলেবেলের পাঠক মাত্রই বুঝতে পারছেন এ জাতীয় চোরদের মারধোর করা অত্যন্ত কঠিন। আমি তাকে ছেড়ে দিলাম। শুধু ছেড়ে দিলাম বলাটা ঠিক হবে না। চোরকে টোষ্ট দিয়ে এক কাপ চাও খাওয়ালাম। সে যেমন হাসি মুখে ধরা পড়েছিল তেমনি হাসি মুখে বিদেয় হল।

এখন কথা হচ্ছে চোরকে আমি চা বিস্কুট খাইয়ে বিদেয় করলাম কেন? সে আমার সঙ্গে অদ্ভুত আচরণ করেছে বলেই কি? এই অদ্ভুত আচরণটা কি তার একটা কৌশল? নাকি লোকটার মাথা খারাপ। ভদ্রলোকের মধ্যে প্রচুর মাথা খারাপ আছে, চোরদের মধ্যে থাকবে না কেন?

আর এটা যদি তার আত্মরক্ষার কৌশল হয় তাহলে চমৎকার কৌশল স্বীকার না করে উপায় নেই। অন্যকে বোকা বানানোর সুন্দর কৌশল। একজন রিকশাওয়ালার গল্প বলি— গুলিস্তানে উঠেছি, যাব ভূতের গলি। ভাড়া চাইল তিন টাকা। আমি বেশ খানিকটা দ্বিধার ভাব নিয়েই রিকশায় উঠলাম। যেখানে আট টাকা ভাড়া হওয়া উচিত সেখানে তিন টাকা চাচ্ছে, রহস্যটা কি? কোন রকম রহস্য টের পাওয়া গেল না। তিন টাকা দেয়া মাত্র রিকসাওয়ালা দেখি চলে যাচ্ছে। আমি ডাকলাম, অবাক হয়েই বললাম, এত কম ভাড়া নিচ্ছ ব্যাপারটা কি?

রিকসাওয়ালা করুণ গলায় বলল, পরশু আসছি ঢাকা শহরে। ভাড়া কত জানি না। যা পাই তাই নেই। কেউ কেউ বেশী দেয়। আমি মনে মনে কই আলহামদুলিল্লাহ। কেউ কেউ আমারে ঠকায়। আমি বেজার হই না। সবই আল্লাহর হুকুম।

আমি মানিব্যাগ থেকে দশটা টাকা বের করে দিলাম। যখন রিকসাওয়ালার সততায় পুরোপুরি মুগ্ধ হয়ে যেতে শুরু করেছি তখন চট করে মনে হল, যে লোক পরশু ঢাকা শহরে এসেছে সে গুলিস্তান থেকে ভূতের গলির মত জায়গায় চলে এল কিভাবে? রিকসাওয়ালা কি আমাকে পুরোপুরি বোকা বানিয়ে গেল?

মুশকিল হচ্ছে কি, এরকম বোকা আমরা হরদম বনছি। এই যুগের মন্ত্র হচ্ছে, কে কাকে কতটা বোকা বানাতে পারে। নাট্যকার নিদারুণ করুণ গল্প লিখে চেষ্টা করছেন দর্শকদের কাঁদিয়ে বোকা বানাতে। দর্শকরা সেই করুণ রসের নাটক দেখে হা হা করে হেসে নাট্যকারকে বোকা বানাতে চেষ্টা করছেন। রাজনীতিবিদ চেষ্টা করছেন জনগণকে বোকা বানাতে, জনগণ চেষ্টা করছেন রাজনীতিবিদদের ফাঁদে ফেলতে। কিছুদিন আগে হয়ে যাওয়া বন্যার কথাটা ধরা যাক। কেন বন্যা হল সেই

সম্পর্কে নানান রকম থিওরী। প্রতিটি থিওরী একদলকে বোকা বানানোর জন্যে তৈরী। যেমন —

(ক) বন্যা হয়েছে কারণ আগের সরকার অপরিকল্পিতভাবে খাল কেটেছেন। নদী ড্রেজিং করাননি। (এই থিওরি বিএনপিকে বেকায়দায় ফেলার জন্যে)।

(খ) বন্যার মূল কারণ পার্শ্ববর্তী রাষ্ট্র। তাদের ফারাক্কা বাঁধ । এই থিওরি খুব সম্ভব শেখ হাসিনাকে বিপদে ফেলবার জন্যে, কারণ তিনি ইদানিং খুব বলে বেড়াচ্ছেন বন্যার সঙ্গে ইণ্ডিয়ার কোন সম্পর্ক নেই। কেন বলছেন কে জানে — হয়ত কাউকে বোকা বানাতে চান।

(গ) বন্যা হচ্ছে আল্লাহর গজব। আল্লাহ যেমন ফেরাউনকে শায়েস্তা করবার জন্যে নূহ নবীর সময়ে মহাপ্লাবন দিয়েছিলেন –বাংলাদেশের বন্যাও তাই।

মন্তব্যটি এরশাদ সাহেবের জনৈক মন্ত্রীর। মন্ত্রী ফেরাউন বলতে কাকে বোঝাচ্ছেন কে জানে। যদি এরশাদ সাহেবকে বোঝাতে চান তাহলে বলতে হবে তিনি বোকা বানাতে চাচ্ছেন খোদ রাষ্ট্রপ্রধানকেই। তবে আমার তা মনে হয় না। এরকম কূটবুদ্ধির কাউকে এরশাদ সাহেব মন্ত্রী বানাবেন না।

(ঘ) বন্যার মূল কারণ আমেরিকা। তাদের কারণেই বিশ্বজোড়া পরিবেশ দূষণ হয়েছে। যার কারণে এই ভয়াবহ বন্যা।

বামপন্থীদের কথা। তারা সম্ভবত নিজেদেরকেই বোকা বানাতে চাচ্ছেন।

আমার এলেবেলে শ্রেণীর লেখাগুলির মূল উদ্দেশ্যও কিন্তু তাই। পাঠকদের বোকা বানানো। প্রথমে চোর নিয়ে অবিশ্বাস্য একটি গল্প ফাঁদলাম, তার সঙ্গে রিকসাওয়ালাকে নিয়ে গল্পটি (এটি সত্যি গল্প) জুড়ে দিলাম। কারণ মিথ্যা সত্যির সঙ্গে মিশিয়ে পরিবেশন করতে হয়, নয়ত তা গ্রহণযোগ্য হয় না। এর পর পরই বোকা বানানো প্রসঙ্গ এনে কিছু আঁতেল জাতীয় কথাবার্তা বলা হল এই আশায় যাতে কিছু পাঠক মনে করেন "আরে এই লোকের এ্যানালিসিস তো খারাপ না।"

অবশ্যি পাঠকরা (যেহেতু তাঁদের বুদ্ধিবৃত্তি লেখকদের চেয়ে উচ্চস্তরের) কি করবেন তাও আমি জানি। এলেবেলে শেষ করে কিছুক্ষণ ঝিম ধরে বসে থেকে লেখকের উদ্দেশ্যে দু'অক্ষরের একটি গালি দেবেন, যে গালিতে আমার বোনের সঙ্গে পাঠকের একটি সম্পর্ক স্থাপিত হবে।

তা নিয়ে আমি ঠিক বিচলিত নই, কারণ বিচলিত হবার কিছু নেই, যুগটাই এমন।

আপনারা জানেন কি না জানি না, সব জেলখানাতেই একটা করে লাইব্রেরী থাকে। লাইব্রেরীতে প্রচুর বই পত্রও থাকে তবে কোন কয়েদী সে সব বই পড়ে না। বই পড়ার জন্য কেউ জেলে আসে না।

একবার একটু অন্য রকম হলো — একজন কয়েদীকে দেখা গেল বই পড়ার দারুণ নেশা। রোজ বই নিয়ে যায়। লাইব্রেরীয়ান বিস্মিত হলেন — ব্যাপারটা কি? একদিন জিজ্ঞেসও করে ফেললেন, কি বই তুমি পড়?

কয়েদী মাথা চুলকে বলল, স্যার নাটকের বই।

ঃ সে কি? শুধু নাটকের বই?

ঃ জ্বি স্যার। নাটক ছাড়া অন্য কিছু আমি পড়ি না ।

ঃ খুব ভাল কথা। নাটক অবশ্যি আমাদের প্রচুর আছে পড়তে পারবে। দরকার হলে আরো কেনাব।

কয়েদী অল্প সময়ে সব নাটক শেষ করে ফেলল। তার জন্যে আরো নাটক কেনা হল। সে সবও শেষ। কয়েদী লাইব্রেরীয়ানকে বিরক্ত করে মারছে — স্যার আরো দিন। আরো দিন। মোটা দেখে দিন।

শেষ পর্যন্ত লাইব্রেরীয়ান বিরক্ত হয়ে টেলিফোন ডাইরেক্টরীটা তার হাতে ধরিয়ে দিয়ে বললেন — বাবারে এইটা নিয়ে যাও। কয়েদী হাসি মুখে টেলিফোন ডাইরেক্টরী নিয়ে গেল। তিন দিন আর তার খোঁজ নেই। চতুর্থ দিনে লাইব্রেরীয়ান নিজেই গেলেন খোঁজ নিতে। গিয়ে দেখেন টেলিফোন ডাইরেক্টরী কোলের উপর নিয়ে সে মহানন্দে পড়ছে। তিনি অবাক হয়ে বললেন,

ঃ কেমন লাগছে পড়তে?

ঃ অদ্ভুত স্যার।

ঃ বল কি?

ঃ তবে স্যার চরিত্রের সংখ্যা অনেক বেশী। মনে রাখতে একটু কষ্ট হচ্ছে, তবুও চমৎকার। শেষের দিকে মনে হয় খুব জমবে।

লাইব্রেরীয়ান অবাক হয়ে এই পাঠকের দিকে তাকিয়ে রইলেন। কি বলবেন ভেবে পেলেন না।

গল্পটা বলার পেছনে আমার একটা উদ্দেশ্য আছে। উদ্দেশ্য হচ্ছে পাঠক যে নানা পদের হতে পারে, সেই সম্পর্কে একটা ধারণা দেয়া। সেই সঙ্গে বলা, এই জাতীয় পাঠকের সঙ্গে আমারও পরিচয় আছে।

সমালোচকরা হচ্ছেন এই জাতীয় পাঠক। প্রমাণ এবং ব্যুৎপত্তি ছাড়া আমি কিছু বলি না — প্রমাণ দিচ্ছি।

মাঝে মাঝে টিভিতে আমি কিছু নাটক-ফাটক লিখি। আহামরি কিছু নয়, আমার অন্যান্য রচনার মতই দূর্বল এবং নিম্ন মানের। এরকম একটা নাটক আমি লিখলাম একজন ডাক্তারকে নিয়ে যে ছুটি কাটাতে বাইরে যাবে, তখন একটা

ঝামেলায় পড়ে গেল। রুগীর অপারেশন হবে ছুটিতে ডাক্তার যেতে পারলেন না স্বামী–স্ত্রীতে ঝগড়া হল ইত্যাদি ইত্যাদি। নাটক প্রচারিত হবার পর দৈনিক বাংলায় কেন জানি আকাশ পাতাল প্রশংসা করা হল। প্রশংসাটা এতই বাড়াবাড়ি ধরণের হল যে আমার মত নির্লজ্জ লোকও লজ্জা পেয়ে গেল। আমার মধ্যে একটু অহংকারও দেখা দিল।

এক বৎসর পর একই নাটক আবার প্রচারিত হল। দৈনিক বাংলায় আবার একটা আলোচনা ছাপা হল। জঘন্য নাটক, কুৎসিত নাটক। ঘটনা নেই, কাহিনী নেই, কিছুই নেই। আমি মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়লাম।

আমি এক তরুণ লেখককে জানি যে 'নিঝুম দ্বীপ', নামে একটা বই লিখেছিল। সেই বইয়ের সমালোচনা করলেন একজন বিখ্যাত ব্যক্তি। সমালোচনার অংশ বিশেষ — 'নিঝুম দ্বীপ' বইটি সাগরে জেগে উঠা ভূখণ্ডের নয়া বসতির আদি পর্ব নিয়ে লেখা। লেখকের গদ্যের স্বচ্ছ প্রবহমানতা, ছোট ছোট ডিটেলের কাজ আমাদের নাড়া দিয়ে যায়। সাগরের নীল বিস্তারে নিঃসঙ্গ দ্বীপটি লেখকের মমতায় জীবন্ত হয়ে উঠে। এই তরুন গদ্যকারকে অভিনন্দন —

খুবই ভাল সমালোচনা। যে কোনো তরুণ লেখকের অভিভূত হয়ে যাবার কথা। কিন্তু এই লেখকটি হলেন না। বরং শুকনো মুখ করে ঘুরে বেড়াতে লাগলেন। কারণ 'নিঝুম দ্বীপ' বইটি ঢাকার একটি বস্তি নিয়ে লেখা। লেখক বস্তিগুলোকে দ্বীপ হিসেবে কল্পনা করে জ্বালাময়ী উপন্যাস ফেঁদেছিলেন।

এত দূর যেতে হয় না, আমি নিজের উদাহরণই দেই। আমার 'আনন্দ বেদনার কাব্য' নামে একটা বই আছে। গল্পের বই। জনৈক সমালোচক এক পৃষ্ঠার একটি সমালোচনা লিখে জানালেন যে 'আনন্দ বেদনার কাব্য' নামের কবিতা সংকলনটি তাঁর ভাল লেগেছে। কিছু কিছু কবিতা সুন্দর হয়েছে আবার কিছু কিছু সাধারণ মানের। ছন্দের ত্রুটি লক্ষণীয়। মিল এবং অনুপ্রাস ব্যবহারের ক্ষেত্রে আমাকে আরো সাবধান হতে উপদেশ দিয়ে সমালোচক লেখা শেষ করেছেন। সেই সমালোচনা পড়ে আমি এতই ঘাবড়ে গেলাম যে, 'আনন্দ বেদনার কাব্য' বইটি কিনে এনে উল্টে পাল্টে দেখলাম — কোন কারণে গল্পগুলি কবিতা হয়ে গেল কিনা। কিছুই তো বলা যায় না। 'দেয়ার আর মেনি থিংস ইন হেভেন এন্ড আর্থ।'

আমি লক্ষ্য করেছি বাংলাদেশে দু'ধরণের সমালোচনা লেখা হয়। ক শ্রেণী এবং খ শ্রেণী।

ক.'আকাশে তোলা' সমালোচনা

খ.'পাতালে পোতা' সমালোচনা।

'ক' শ্রেণীতে আকাশে তুলে দেয়া হবে। নমুনা — এই তরুণ লেখক আমাদের মনে করিয়ে দেন দস্তয়েভস্কি, টলস্টয় এবং চেখভের কথা। সেই সব মহান লেখকের যে অন্তর্দৃষ্টি যে বর্ণনা শৈলী আমাদের মোহাবিষ্ট করে এই তরুণ লেখকও তাই করেছেন। আমরা মুগ্ধ বিস্মিত।

তাদের হাতে টেলিফোন ডাইরেক্টরী ধরিয়ে যদি বলা হয় এটা একটি নাটক এর উপর একটি ক শ্রেণীর সমালোচনা লিখে দিন। তা হলে তাঁরা লিখবেন — 'নাটকের চরিত্র অনেক বেশী, তাতে সাময়িক অসুবিধা হয়, তবে বর্ণনাক্রমিক সাজানো বলে সেই অসুবিধা প্রধান হয়ে ওঠে না। কাহিনীর গতি জায়গায় জায়গায় শ্লথ, হাস্যরসের প্রাধান্য আর একটু থাকলে ভাল হতো। বিশাল একটা নাটক ধরে রাখার ক্ষেত্রে হাস্যরসের গুরুত্ব অস্বীকার করা যায় না'—

'খ' শ্রেণীতে পাতালে পুঁতে দেয়া হবে। নমুনা — 'প্রথমে বলে নেয়া ভাল এটা একটা চোরাই মাল। লেখক অন্যের জিনিষ তাঁর নিজের বলে চালাতে চেষ্টা করছেন। অতি নিম্নমানের শ্লথ গদ্য। কাচা বর্ণনা শৈলী, শব্দের ভুল প্রয়োগ দেখে ভাবতে হয় কেন এই আবর্জনা ছাপা হল?'

একই রচনাকে একজন সমালোচক 'ক' শ্রেণী এবং অন্যজন 'খ' শ্রেণীতে ফেলছেন এ রকম উদাহরণ প্রচুর আছে। আমি আমার নিজের একটি রচনার উপর প্রকাশিত সমালোচনা থেকেই দিতে পারি। কি হবে তাতে?

বহুব্রীহি প্রসঙ্গ

আদি কাণ্ড

এইসব দিনরাত্রির পর ঠিক করেছিলাম আর না, যথেষ্ট হয়েছে, এখন থেকে ঘরে বসে থাকব, লেখালেখি সীমাবদ্ধ থাকবে গল্প এবং উপন্যাসে। নাটক আমার লাইন নয়। বিশেষ করে টিভি নাটকে অনেক 'টেকনিক্যাল' খুঁটিনাটি মাথায় রাখতে হয় — খুব চাপ পড়ে। এরচে' ক্লান্ত দুপুরে চমৎকার একটা উপন্যাস হাতে নিয়ে শুয়ে থাকা অনেক লোভনীয়।

কিন্তু মুশকিল হচ্ছে — একবার বেলতলায় গেলে বার বার যেতে হয়। ব্যাপারটা অনিবার্য নিয়তির মত। কাজেই দ্বিতীয় দফায় বেলতলা যাবার প্রস্তুতি নিলাম। 'নীরস গল্প' নামে দু'টি এপিসোড লিখে নিয়ে গেলাম প্রযোজক নওয়াজীশ আলী খানের কাছে। তিনি না পড়েই বললেন 'অপূর্ব'। আগামী প্রান্তিক থেকে এই জিনিস যাবে। যাবে বললেই সব জিনিস যায় না, এটিও গেল না। ছ'মাস পড়ে রইল। এই ছ'মাসে কিছু কিছু পরিবর্তন হল, নাম বদলে গেল। নীরস গল্প থেকে বহুব্রীহি। কাহিনীও নামের সঙ্গে পাল্টে গেল। হাসি তামাশার ফাঁকে হাস্যকর নয় এমন কিছু জিনিস ঢুকিয়ে দেয়া হল। এইবার চরিত্র নির্বাচনের পালা। আমি বললাম অর্ধেক নেয়া হোক একেবারে আনকোরা শিল্পী, বাকি অর্ধেক পুরনো লোকজন। নওয়াজীশ আলি খান বললেন — অপূর্ব! প্রসঙ্গক্রমে বলে রাখি এই ভদ্রলোক আমার সব আইডিয়াকেই অপূর্ব বলে থাকেন। একবার সংলাপবিহীন একটি নাটকের আইডিয়া তাঁকে দিয়েছিলাম — তিনি যথারীতি বলেছিলেন, অপূর্ব!

তিন নতুন

তিনজন নতুন যুক্ত হলেন টিভিতে। কাদের, পুতুল এবং মিলির বড় বোন। অডিশন ছাড়া নতুনরা টিভিতে অভিনয় করতে পারেন না বলে একটি আইন

আছে। সব আইনের যেমন ফাঁক আছে — এই আইনেরও আছে। কাজে কাজেই স্পেশাল অডিশনের ব্যবস্থা হল। পাঠকরা শুনে বিস্মিত হবেন যে কাদের (আফজাল শরীফ) অডিশনে পাশ করতে পারল না। বেচারা কাদেরকে থিয়েটার থেকে আমি এনেছিলাম এবং আমি তার মহাপুরুষ নাটকে অভিনয় দেখে তার অভিনয় ক্ষমতা সম্পর্কে নিশ্চিত ছিলাম অথচ সে অডিশনে পাশ করতে পারছে না। এর মানে কি? তাহলে কি আমি ধরে নেব অডিশন বোর্ডের কর্মকর্তারা প্রতিভা যাচাইয়ের ব্যাপারটায় মাঝে মাঝে ভুল করেন? কে জানে. কাদেরের মত অনেক প্রতিভাবান অভিনেতাদেরও হয়ত অডিশনে ফেল করে চলে যেতে হয়েছে।

যাই হোক কাদেরের ভাগ্য ভাল ছিল। কারণ বহুব্রীহির প্রযোজক নাট্যকারের ইচ্ছার কথা মনে রেখে কিভাবে জানি কাদেরের জন্যে শুধুমাত্র বহুব্রীহিতে অভিনয়ের অনুমতি জোগাড় করলেন।

বহুব্রীহিতে পুতুলও যুক্ত হল আমার অনুরোধে। এই মেয়েটি কেমন অভিনয় করে কিছুই জানতাম না শুধু জানতাম তার অভিনয়ের খুব আগ্রহ এবং সে এ বছরেই এসএসসি পরীক্ষায় হিউম্যানিটিজ গ্রুপে ছেলেমেয়ে সবার মধ্যে প্রথম হয়েছে। এরকম 'স্মার্ট' একজনকে সুযোগ না দেয়ার কোন কারণ থাকতেন পারে না।

পুতুল (দীপা ইসলাম) বেশ ভালভাবে অডিশনে পাশ করল। তবু আমার মনে হচ্ছিল, যে অভিনয় তার কাছ থেকে আমি আশা করছি তা পাব না। এই মেয়ে ছোটবেলায় অভিনয় করেছে তবে স্টেজে বাচ্চাদের নাটকে অভিনয় এক জিনিস আর টিভির তিনটি ক্যামেরার সামনে দাঁড়ানো অন্য জিনিস। মুখের উপর যখন হাজার ওয়াটের আলো এসে পড়ে তখন সব গুলিয়ে যায়। শিল্পী নামের মেয়েটির বেলায়ও একই কথা মনে হল।

চরিত্র ভাগ করে দেয়া হল। বাবা হিসেবে আবুল হায়াত এলেন তবে মন খারাপ করে এলেন। তিনি চাচ্ছিলেন মামার ভূমিকা। বাবার ভূমিকা পেয়ে এতই বিমর্ষ হলেন যে এক পর্যায়ে আমাদের ধারণা হল তিনি হয়ত অভিনয় করবেন না। অভিনেতা আফজাল হোসেনকেও তাঁর চরিত্র নিয়ে খুব চিন্তিত মনে হল। তিনি বার বার বলতে লাগলেন, আমি তো ধারাবাহিক নাটকে অভিনয় করি না কাজেই চরিত্রটি সম্পর্কে পুরোপুরি নিশ্চিত হতে চাই। আমি তাঁকে আশ্বস্ত করলাম। বললাম — চরিত্রটিতে আপনি অভিনয়ের সুযোগ পাবেন। তিনি দু'টি এপিসোড পড়ে বেশ খুশী মনেই রাজি হলেন। নওয়াজীশ আলি খান হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন। আফজালকে দলে পাবার জন্যে তাঁর গভীর আগ্রহ ছিল। সেই আন্তরিক আগ্রহের

মর্যাদা যদিও শেষ পর্যন্ত আফজাল দিলেন না। লেখকের তৈরি চরিত্র তাঁর অপছন্দ হবার কারণে বহুব্রীহি ছেড়ে চলে গেলেন। আমার জন্যে তা বেদনাদায়ক ছিল!

গল্পের কাঠামো

আমি কখনো খুব চিন্তা-ভাবনা করে কিছু লিখতে পারি না। সব সময় ভরসা করি 'কলমটার' উপর কিংবা বলা যেতে পারে কলমের টানের উপর। কলমের টানে কিছু না কিছু এসে যাবেই, এটাই আমার বিশ্বাস। তবে বহুব্রীহি নিয়ে আমি যথেষ্ট চিন্তা-ভাবনা করলাম। একটা পরিবার হল গল্পের কেন্দ্রবিন্দু। পরিবারের প্রতিটি পুরুষ আধা-পাগল ধরনের কিন্তু মেয়েগুলি সুস্থ ও স্বাভাবিক। যাত্রা দলের বিবেকের মত একটি চরিত্র থাকবে যে বিশেষ মুহূর্তে উপস্থিত হবে এবং বিবেকের দায়িত্ব পালন করবে। পরিবারের বাইরের একজন প্রেমিক বোকা (ডাক্তার) থাকবে। এই চরিত্রটিকে ব্যালান্স করবার জন্যে থাকবে একজন বোকা প্রেমিকা (এশা, মামার সেক্রেটারী)। পরিবারের প্রধান ব্যক্তি একজন নিতান্তই সরল, ধর্মভীরু, ভাল মানুষ যিনি পৃথিবীর যাবতীয় সমস্যায় কাতর। সমস্যা সমাধানের তাঁর পরিকল্পনা নিয়েই গল্প আবর্তিত হবে।

মূল গল্প হাস্যরস প্রধান হলেও পাশাপাশি একটি করুণ স্রোত প্রবাহিত হবে। মাঝে মাঝে সেই স্রোত ব্যবহার করা হবে।

বিশেষ বিশেষ কিছু বক্তব্যও হাসি তামাশার ফাঁকে ফাঁকে রাখা হবে। কিছু সত্যিকার সমস্যার প্রতিও ইঙ্গিত করা হবে। তবে সমস্যাগুলি নিয়ে বেশিদূর যাওয়া হবে না। সরকার প্রচারিত একটি মাধ্যমে সেই সুযোগও অবশ্যি নেই।

এত ভেবে-চিন্তে কেন গল্পের কাঠামো দাঁড় করালাম? কলমের টানের উপর বিশ্বাস কেন করলাম না? কারণটা খুব সাধারণ। 'হিউমার' করার কাজটা কঠিন। বিশেষ করে আমাদের দেশে। কোন একটি দৃশ্য দেখে হেসে ফেললেও আমরা সঙ্গে সঙ্গে গম্ভীর হয়ে বলি — কুরুচিপূর্ণ ভাঁড়ামো। অন্য কোথাও লজিক খুঁজি না, অথচ হাসির নাটক এলেই ভ্রূ কুঁচকে লজিক খুঁজতে বসি। কখনো ভাবি না হাসির নাটক মানেই চড়া রঙের ব্যাপার। জীবন যে রকম আছে হুবহু সেই রকম তুলে আনলে আমাদের হাসি আসে না। জীবনকে কোন এক অদ্ভুত দৃষ্টিকোণ থেকে দেখতে পারলেই শুধু হাসা যায়। কলার খোসায় পা পিছলে পড়ে যাওয়া একটা দুঃখজনক ব্যাপার। কিন্তু দুঃখজনক ব্যাপার দেখেও আমরা হাসি। কেন হাসি?

জাতি হিসেবে বাঙ্গালীর রসবোধ অত্যন্ত তীক্ষ্ণ। সাধারণ কথাবার্তায় আমরা চমৎকার রসিকতা করি। তবুও কেন জানি নাটকে রসিকতা করে তাদের ঠিক হাসানো যায় না। তাঁরা গম্ভীর হয়ে বলেন, এর মধ্যে শিক্ষণীয় তো কিছু দেখছি না।

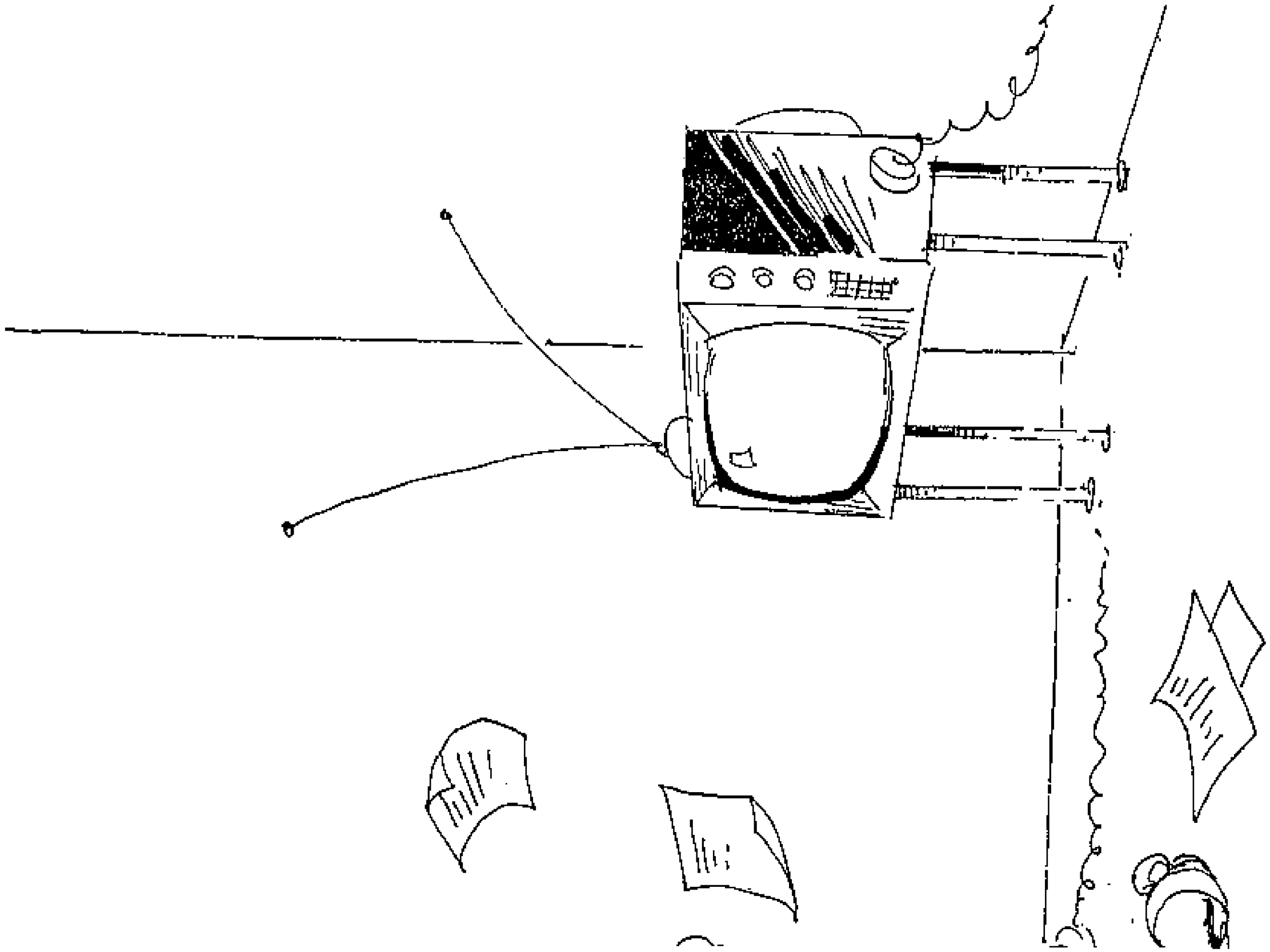

এ জাতীয় কথাবার্তা যাতে কম শুনতে হয়, যাতে দর্শকদের এক অংশকে অন্তত সন্তুষ্ট করতে পারি, সেই কারণেই আমার আটঘাঁট বাঁধা। দীর্ঘ প্রস্তুতি পর্ব। তবুও আমি ধরেই নিয়েছিলাম নিম্নলিখিত মন্তব্যগুলি আমাকে হজম করতে হবে।

(ক) এইসব দিনরাত্রির পর এই জিনিস? ওয়াক থু।

(খ) ব্যাটা কাতুকুতু দিয়ে হাসানোর চেষ্টা করছে — গোপাল ভাঁড় কোথাকার।

(গ) নাট্যকার কি ভেবেছে আমরাও তার মত ব্রেইনলেস?

(ঘ) কত বড় ফাজিল — নাটকের মধ্যে আবার সমস্যাও বলে — আরে তুই সমস্যার জানিস কি?

এই জাতীয় মন্তব্যের জন্যে আমি মানসিকভাবে তৈরি ছিলাম। যার জন্য তৈরি থাকা হয় সচরাচর তা ঘটে না। তার চেয়েও ভয়াবহ ব্যাপার ঘটে। আমার ক্ষেত্রেও ঘটল। একদল মানুষ আমার উপর ক্ষেপে গেলেন।

গোড়ায় গলদ

প্রথম পর্বের মহড়াতেই ঝামেলা বেঁধে গেল। শিল্পী নামের মেয়েটি বলল প্রথম পর্বের শেষ অংশ সে করতে পারবে না। কারণ সে পানিতে নামবে না। প্রথম পর্বটির শেষ দৃশ্যে ডাক্তারকে বাঁচানোর জন্যে মেয়েটির পানিতে ঝাঁপ দেয়ার কথা। শুরুতেই যন্ত্রণা। আনা হল লুৎফুন্নাহার লতাকে। তিনি পানিতে ঝাঁপ দিতে রাজি হলেন। শিল্পীকে দেয়া হল অন্য একটি চরিত্র। সব কেমন যেন এলোমেলো হয়ে গেলো। গল্পের যে কাঠামো আমার মাথায় ছিল তাতে বড় রকমের হেরফের করতে হল। পুতুল ছিল সোবহান সাহেবের ছোট মেয়ে, সে হয়ে গেল এমদাদের নাতনি । আরো কিছু ছোটখাট যন্ত্রণা পার করে প্রথম পর্বের রেকর্ডিং শেষ হল। যথারীতি প্রচারিত হল। দ্বিতীয় পর্ব প্রচারিত হল না। শুরু হল বন্যা । চরম দুঃসময়ে কি আর হাসি তামাশা দেখতে ইচ্ছে করে? বহুব্রীহি বাক্স বন্দী হয়ে গেল। দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে ভাবলাম –বহুব্রীহির কপালে অনেক দুঃখ আছে।

নওয়াজীশ আলি খান সাহেবও খুব মন খারাপ করলেন। তবে তিনি মন খারাপ করলেন সম্পূর্ণ ভিন্ন কারণে। প্রথম পর্বে আনিসের মৃতা স্ত্রীর যে ছবিটি টানানো ছিল সেটি তাঁর স্ত্রীর । বেচারা কোন জীবিত মহিলাকে মৃতা হিসাবে ছবিতে দেখাবার ব্যাপারে রাজি করাতে না পেরে তাঁর স্ত্রীর ছবি স্ত্রীকে না জানিয়েই ব্যবহার করলেন । বেচারী গেলেন রেগে । এবং ঘোষণা করলেন এই ছবি আর ব্যবহার করা যাবে না। অথচ গল্পটা এমন যে এই ছবি অনেকবার ব্যবহার করতে হবে। এই জটিল সমস্যার সমধান বেচারা নওয়াজীশ আলি খান কি করে করবেন বুঝতে পারলেন না।

নতুন যাত্রা

বন্যার পানি নেমে যাবার পর আবার বহুব্রীহি শুরু হল। দ্বিতীয় পর্ব থেকে নয় প্রথম পর্ব থেকে। নওয়াজীশ আলি খান সুযোগ পেলেন তাঁর স্ত্রীর ছবি পাল্টানোর। নতুন ছবি টানানো হল।

নতুন যাত্রা মন্দ হল না। অভিনেতা অভিনেত্রীরা চমৎকার অভিনয় করলেন। বাবা, মামা, নূর, তার দুই পুত্র কন্যা, আফজাল, মিলি, আফজাল শরীফ, রহিমার মা। কেহ কারে নাহি পারে সমানে সমান। আলাদাভাবে এদের কথা বলা অর্থহীন। এঁরা প্রত্যেকেই তাঁদের প্রতিভার পূর্ণ ব্যবহার করলেন। শুধু বড় মেয়েটি এই সুপারস্টারদের সঙ্গে নিজেকে মেলাতে পারল না। তার দিক থেকে চেষ্টার কোন ত্রুটি ছিল না। কিন্তু কিছু জিনিস আছে চেষ্টাতে হয় না।

আমার মন খারাপ হয়ে গেল কারণ বড় মেয়েটিকে নিয়ে গল্পের যে কাঠামো ছিল তা এখন ভাঙ্গতে হবে । নতুন কাঠামো তৈরী করতে হবে। অথচ গল্প এগিয়ে গেছে।

প্রথমদিকে পুতুলও আমাকে খানিকটা আশাহত করেছিল। দেখলাম ক্যামেরায় তাকে ভাল দেখাচ্ছে না। দুঃখের ব্যাপারগুলি যত সহজে ফুটিয়ে তুলছে অন্যগুলি তত সহজে আসছে না। তার দ্রুত কথা বলার নিজস্ব ভঙ্গি নাটকেও চলে এল।

বড় মেয়ে এবং পুতুল এই দু'জনকেই চতুর্থ পর্বে বাদ দেয়ার পরিকল্পনা করলাম। মাঝে মাঝে আমি খুব নির্মম হতে পারি। পুতুল শেষ পর্যন্ত টিকে গেল নওয়াজীশ আলী খান সাহেবের অনুরোধে। তিনি বললেন, আরো দু'একটা পর্ব দেখুন । দেখলাম। মনে হল — এ পারবে । তার গল্প অনুভব করবার ক্ষমতা আছে। বড় অভিনেতা হবার যা প্রথম শর্ত। বড় মেয়েটিকে বাদ দিতে হল। নবম পর্বে আমি আবার তাকে আনতে চেয়েছিলাম। নওয়াজীশ আলী খান সাহেব রাজি হলেন না।

খুব উৎসাহ নিয়ে নতুন যাত্রা শুরু হয়েছিল। উৎসাহ পুরোপুরি বজায় রইল না। আমাকে বারবার কাঠগড়ায় দাঁড়াতে হল। তুচ্ছ সব বিষয় – কিন্তু তুচ্ছ থাকল না।

সৈয়দ বংশ!

আমি যতদূর জানি, আরবী ভাষায় সৈয়দ হচ্ছে একটি সম্মানসূচক পদবী যার মানে জনাব বা ইংরেজী 'মিষ্টার'। যে কোন মুসলমান তাঁর নামের আগে সৈয়দ ব্যবহার করতে পারেন । সৌদী আরবে কিছু সম্মানিত অমসুলমানের নামের

আগেও এই সৈয়দ ব্যবহার করে তাঁদের সম্মান জানানো হয়। অথচ ভারতবর্ষে এই পদবীর ব্যবহারকারীরা দাবী করে তাঁরা হযরত মোহাম্মদ (দঃ)-এর বংশধর।

ধরা গেল তাঁদের দাবী সত্য – তাহলেও কিন্তু সমস্যা মেটে না । যে ইসলাম সাম্যের বাণী প্রচার করে সেই মহান সাম্যবাদ দূরে ফেলে আমরা কিন্তু জাতিভেদ তৈরি করি । এক সময় সৈয়দরা বংশ মর্যাদার ধুয়া তুলে অন্যদের শোষণ করেছে । আমি রসিকতার কারণেই সৈয়দ বংশ ব্যবহার করেছি। কারণ আজ আর সৈয়দ বংশ কোন সমস্যা নয়।

কেউ যদি মনে করেন সৈয়দ নিয়ে রসিকতা মানে আমাদের নবীর সম্মানহানি করা তাহলে তিনি খুব বড় ধরণের ভুল করবেন। নবীর বংশধররা (?) সবাই নবীর মত এরকম মনে করার কোন কারণ নেই । তাদের নিয়ে কিছু রঙ্গ রসিকতা অবশ্যই করা যায়।

ধর্ম !

আমার জন্ম একটি ধর্মভীরু মসুলমান পরিবারে যেখানে ধর্মীয় অনুষ্ঠানগুলি কঠিনভাবে মানা হয়ে থাকে । যার প্রতিফলন আছে বহুব্রীহিতে । বহুব্রীহির কেন্দ্রীয় চরিত্র সোবাহান সাহেব একজন অত্যন্ত ধর্মভীরু মানুষ। ধর্মীয় অনুশাসন যিনি কঠিনভাবে মানেন। যাঁর সৎ আত্মার জন্মও হয়ত ঐ কারণেই হয়েছে। সোবাহান সাহেব নিয়মিত রোজা রাখেন। তারপরেও ক্ষুধার স্বরূপ বোঝার জন্যে তিনি দীর্ঘ উপবাসে চলে গেলেন। তিনি বললেন — রোজা রেখে তিনি ক্ষুধার স্বরূপ বুঝতে পারেন না, কারণ সারাক্ষণই তাঁর মনে থাকে ইফতারের সময় প্রচুর খাবার দাবার পাওয়া যাবে। প্রকৃত ক্ষুধার্তদের এরকম খাবারের নিশ্চয়তা নেই। এটা হচ্ছে সৎ মানুষের সৎ উক্তি। এখানে রোজার প্রতি কটাক্ষ কোথায়?

সিমের বীচি এই নাটকে ব্যবহার করা হয়েছে এক লক্ষবার কানে ধরে উঠবস করার হিসেবের জন্যে। আপত্তি উঠেছে এখানেও । ধর্মীয় কাজে এই বীচি ব্যবহার করা হয়। খতম পড়ানো হয়। কাজেই এর অন্য কোন ব্যবহার করা যাবে না । একসময় ধর্মযুদ্ধে তরবারী ব্যবহার করা হয়েছে। কাজেই আমরা কি ধরে নেব তরবারী একটি ধর্মীয় জিনিস, এর অন্য কোন ব্যবহার চলবে না? আমাদের লজিক এত হালকা হবে কেন? ধর্ম কি এমন কোন ব্যাপার যে সিমের বীচিতেও তা থাকবে?

রহিমার মা

আমি কঠিন বিপদে পড়লাম রহিমার মাকে নিয়ে যখন তিনি খাবার টেবিলে সবার সঙ্গে একত্রে খেতে বসলেন। এটি নাকি খুবই কুরুচিপূর্ণ দৃশ্য । কাতুকুতু

দিয়ে হাসানোর অপচেষ্টা, আমার স্থূল বুদ্ধির পরিচায়ক। কোন কোন পত্রিকাতেও তা লেখা হল।

কি গভীর বেদনার একটা ব্যাপার। মুখে মুখে আমরা সাম্যবাদের কথা বলি। মানুষে মানুষে ভেদাভেদ নেই ইত্যাদি। অথচ যেই একটি কাজের মেয়ে একসঙ্গে খেতে বসে গেল ওম্নি আমাদের মাথা খারাপ হয়ে গেল।

একজন অত্যন্ত নামী বুদ্ধিজীবী (নাম বলছি না কারণ তাঁকে লজ্জা দিতে চাই না) নাটকের এই পর্ব প্রচার হবার সঙ্গে সঙ্গে ক্রুদ্ধ হয়ে আমাকে টেলিফোন করে বললেন, হুমায়ূন সাহেব, আপনার কাজের মেয়েটি কি আপনার সঙ্গে এক সঙ্গে খেতে বসে?

আমি বললাম — না।

'যদি আপনার কাজের মেয়ে আপনাদের সঙ্গে খেতে না বসে তাহলে কোন স্পর্ধায় আপনি টিভিতে এই জিনিস দেখালেন?'

আমি ঠান্ডা গলায় বললাম, আমার কাজের মেয়ে আমার সঙ্গে খেতে বসে না তার কারণ আমি আপনার মতই একজন । সাম্যের কথা মুখে বলি কাজে দেখাই না কিন্তু সোবাহান সাহেব আপনার বা আমার মত নন। তিনি অন্তরে যা বিশ্বাস করেন কাজেও তা প্রতিফলিত হয়।

একদিনের কথা। বহুব্রীহির রিহার্সেল হচ্ছে । রহিমার মা আমার কাছে এসে ক্লান্ত গলায় বললেন, বাবা লোকজন আমাকে খুব গালাগালি করে।

আমি বললাম, কেন?

'আমি যে খাওয়ার টেবিলে খাইতে বসছি।'

আমি বললাম, আপনি বলবেন এটা একটা পাগলদের নাটক। এখানে অনেক কিছুই হবে এর কোনটাই সত্যি না।

ডাক্তার ডাক্তার!!

পনেরো বছর আগে আমার বড় মামীর ইউরিনারী ব্লাডার ফুটো হয়ে গিয়েছিল। দীর্ঘ পনেরো বছর তিনি অমানুষিক জীবন-যাপন করলেন। ময়মনসিংহ মেডিক্যাল কলেজ এবং ঢাকা মেডিক্যাল কলেজের ডাক্তাররা বললেন — কিছু করার নাই। শেষ পর্যন্ত সিলেট মেডিক্যাল কলেজের সার্জারীর প্রফেসর (নাম খুব সম্ভব রাজা চৌধুরী) সাহস করে এগিয়ে এলেন। তিনি একটি সাহসী পরিকল্পনা গ্রহণ করলেন — মামীর জরায়ু কেটে — সেই কাটা জরায়ু দিয়ে ব্লাডারের ফুটো বন্ধ করে দিলেন। আশ্চর্যের ব্যাপার, মামী সুস্থ হয়ে গেলেন। বলা যেতে পারে তার নব জন্ম হল। আমি ঐ সার্জনের প্রতি সম্মান দেখানোর জন্য লিখলাম টিভি নাটক

'অবসর'। একজন নিবেদিতপ্রাণ সার্জনকে নিয়ে গল্প। যিনি জীবন কাটিয়ে দিয়েছেন ছুরি কাঁচি হাতে। যাঁদের তিনি সারিয়ে তোলেন, তাদের প্রতি তাঁর কোন মমতা নেই । মমতা নেই – স্ত্রী এবং কন্যার প্রতি । ভালবাসেন ছুরি ও কাঁচিকে ।

সমাজের সব ডাক্তার তাঁর মত নয়। এই সমাজের দায়িত্বজ্ঞানহীন ডাক্তার আছেন। অর্থলোলুপ ডাক্তার আছেন। এমন ডাক্তারও আছেন যিনি ঠান্ডা মাথায় নিজের স্ত্রীকে হত্যা করেন। এঁদের নিয়ে নাটক লেখার কথা আমার কখনো মনে হয়নি। মানুষের চরিত্রের অন্ধকার দিক আমাকে কখনো আকর্ষণ করে না । আমি সবসময় মানুষের চরিত্রের আলোকিত অংশ নিয়ে কাজ করি। আমার লেখা সেই কারণে অনেকের কাছে বাস্তবতা–বর্জিত এক ধরণের কল্পকাহিনী বলে মনে হয়। তার জন্য আমার মনে কোন ক্ষোভ নেই।

মানুষের হৃদয়ের অন্ধকার অলিগলি নিয়ে তো সব লেখকরাই কাজ করেন। আমি না করলে কোন ক্ষতি হবে না । তাই আমার বহুব্রীহির ডাক্তার বোকা, কিন্তু সে দরিদ্র মা'র অনুরোধে নিজের বিয়ের কথা ভুলে গিয়ে হাসপাতালে ছুটোছুটি করতে থাকে। আশ্চর্যের ব্যাপার, একজন বোকা ডাক্তার দেখে ডাক্তাররা এবং হবু ডাক্তাররা আমার উপর ক্ষেপে যান। তাঁরা প্রত্যেকেই নিজেদের 'আইডেনটিফাই' করতে থাকেন বহুব্রীহির ডাক্তারের সঙ্গে। অথচ ভুলে যান সোবহান সাহেবের বড় মেয়েটিও ডাক্তারী পড়ে। সে বোকা নয়। শান্ত, বুদ্ধিমতী ও হৃদয়বান একটি মেয়ে। তাঁরা সেই মেয়েটির কথা মনে না করে আফজালের কথা মনে করেন। তাঁরা তাঁদের ক্ষোভের প্রকাশ যে ভঙ্গিতে করেন তা ভাবতেও লজ্জা লাগে। আমার কুশপুত্তলিকা দাহ করা হয়, বইপত্র পুড়িয়ে দেয়া হয়। অনবরত টেলিফোন করে

আমাকে বলা হয় আমার বা আমার পরিবারের কোন সদস্যদের চিকিৎসা ডাক্তাররা করবেন না।

একদিনের কথা বলি। নওয়াজীশ আলী খান বহুব্রীহির ইউনিট নিয়ে গিয়েছেন হলি ফ্যামিলি হাসপাতালে। অপারেশনের একটি দৃশ্যের চিত্রায়ন হবে। ডাক্তাররা যেই শুনলেন ইউনিটটি বহুব্রীহির তাঁরা সহযোগিতা করতে অস্বীকার করলেন।

বেয়াদব শিশু

নিষা এবং টগর।

যথেষ্ট মমতা নিয়ে এই দু'টি চরিত্র তৈরি করেছিলাম। মা নেই, দু'টি শিশু — বাবার স্নেহে বড় হচ্ছে। যারা বিশ্বাস করে একদিন তাদের মা ফিরে আসবে — অথচ আসে না। এরকম দু'টি শিশুর আচরণ যা হওয়া উচিত আমি চেষ্টা করেছি বাচ্চা দু'টিকে সে রকম রাখতে। অবাক হয়ে লক্ষ্য করলাম কোন কোন পত্রিকায় লেখা হতে থাকল, আমি শিশুদের বেয়াদব বানাচ্ছি। শিশুরা কিছুই শিখছে না। নাটক দেখে দেখে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে।

প্রেস ক্লাবের সামনে পাগল

বহুব্রীহির এক পর্বে একটি ডাক্তার আনিসকে বলল কোথায় একটা ভদ্র পাগল পাওয়া যায় বলতে পারেন? আনিস বলল, অনেক জায়গায় আছে তবে প্রেস ক্লাবের সামনে প্রায়ই একজনকে দেখা যায়।

এরপর পরই একটা কঠিন চিঠি ছাপা হল। সংবাদ কিংবা ইত্তেফাকে। পত্রলেখক অতি কঠিন ভাষায় আমাকে আক্রমণ করলেন। কারণ আমি নাকি প্রেস ক্লাবের সামনে যেসব বিপ্লবী মানুষ অনশন করেন তাদের অপমান করছি। এই হাস্যকর চিঠি সংবাদপত্রের সম্পাদকরা যখন ছাপেন তখন তা আর হাস্যকর থাকে না। কারণ সম্পাদক চিঠির বক্তব্যকে গুরুত্ব দিচ্ছেন বলেই ছাপছেন।

জাপানী একটি কবিতার কথা মনে পড়ছে।

বল দেখি কোথা যাই
কোথা গেলে শান্তি পাই
ভাবিলাম বনে যাব
তাপিত হিয়া জুড়াব,
সেখানেও অর্ধরাতে
কাঁদে মৃগী কম্প গাত্রে।

পাকুন্দিয়া কলেজ

খুব সম্ভব বহুব্রীহির দ্বিতীয় পর্বে পাকুন্দিয়া থেকে এলেন এমদাদ সাহেব। টাউট ধরনের লোক। সোবাহান সাহেব এমদাদের কাছে জানতে চাইলেন — তাঁর কলেজ কেমন চলছে। যে কলেজ তিনি নিজের টাকায় গড়ে তুলেছেন। টাউট এমদাদ বলল — কলেজ খুব ভাল চলছে। নকলের এমন সুযোগ আর অন্য কলেজে নেই। শিক্ষকরাও নকলের ব্যাপারে সাহায্য করেন।

এই চরিত্রটি কিন্তু বেশ কিছু প্রাইভেট কলেজের বাস্তব ছবি। কিন্তু নাটকে বলা মাত্র পাকুন্দিয়া কলেজের অধ্যক্ষ আইনের আশ্রয় নেবেন বলে কঠিন চিঠি পাঠালেন নওয়াজীশ আলি খানকে। কারণ তাঁর কলেজের সম্মান হানি করা হয়েছে।

এই ভদ্রলোক একবারও ভাবলেন না যে তাঁর কলেজটি সোবাহান সাহেবের টাকায় তৈরি হয়নি। যে কলেজের কথা নাটকে বলা হয়েছে সেই কলেজ সোবাহান সাহেবের দানে তৈরি। অথচ পাকুন্দিয়া কলেজের অধ্যক্ষ ধরে নিলেন যে তাঁর কলেজ সম্পর্কে বলা হচ্ছে। কলেজের অধ্যক্ষের বিচার বিবেচনা যদি এরকম হয় তাহলে অন্যদের দোষ দিয়ে লাভ কি?

আমার তো মনে হয় মেডিকেলের ছাত্ররা ঠিকই করেছে। আমার কুশপুত্তলিকা দাহ করে বাড়াবাড়ি করেনি। যেমন গুরু তেমন শিষ্যই তো হবে।

শেষ কথা

বহুব্রীহিতে যা করতে চেয়েছিলাম তার সবটাই কি জলে গেছে? মনে হয় না। আমার দুঃসময়ের অনেকেই আমার পাশে এসে দাঁড়িয়েছিলেন। কঠিন আক্রমণের জবাব তারাই দিয়েছেন — আমাকে কোন জবাব দিতে হয়নি। যে মমতা ও ভালোবাসা তাঁরা আমাকে দেখিয়েছেন আমি দীর্ঘদিন তা মনে রাখব।

একটা বিরাট দর্শক শ্রেণীর ভালবাসাও আমি পেয়েছি। আমার সমস্ত অক্ষমতা তাঁরা দেখেছেন ক্ষমার চোখে এবং কিছুটা প্রশ্রয়েরও চোখে।

এই ভালবাসার মূল্য দেবার সাধ্য আমার নেই। যদি থাকত বড় ভাল হত।

অয়োময়

বেদনা ও আনন্দময় অভিজ্ঞতার গল্প

নিউমার্কেটে আমি আমার স্ত্রীকে নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছি। সৈয়দ শামসুল হকের সঙ্গে দেখা। তিনি হাসিমুখে জিজ্ঞেস করলেন, কি লিখছেন?

আমি বললাম, 'অয়োময়' লিখছি।

তিনি বিস্মিত হয়ে বললেন, সাহিত্য কিছু লিখছেন না?

এই দিয়েই 'অয়োময়' প্রসঙ্গ শুরু করি। তবে শুরুর আগে বলে নেই সৈয়দ হকের এই কথায় আমি আহত হয়েছি। টিভির জন্য নাটক লিখলে সাহিত্য হবে না, মঞ্চের জন্যে লিখলে সাহিত্য হবে, এই অদ্ভুত ধারণা তিনি কোথায় পেলেন কে বলবে। যে 'অয়োময়' আমি টিভিতে দিচ্ছি মঞ্চে তা দিয়ে দিলেই সাহিত্য হয়ে যাবে? আমি কেমিস্ট্রির ছাত্র, এইসব ব্যাপার বুঝি না, তাঁর মতামত মেনে নিয়েই(!) আজকের লেখা শুরু করি —

অয়োময়ের আগে আরো দু'টি 'অসাহিত্য' টিভির জন্যে লিখেছিলাম — এইসব দিনরাত্রি, বহুব্রীহি। বহুব্রীহি শেষ করবার পর একটা বড় কাগজে লিখলাম – – এই জীবনে আর ধারাবাহিক নাটক লিখব না। আমার বড় কন্যা সেই লেখা ফ্রীজের গায়ে আটকে দিল। ঠাণ্ডা পানির জন্যে যতবার ফ্রীজের দরজা খুলি ততবার লেখাটার দিকে চোখ পড়ে। এক সময় মনে হল সেলফ হিপনোসিস প্রক্রিয়া কাজ করেছে — মাথা থেকে ধারাবাহিক নাটকের ভূত নেমে গেছে। ফ্রীজের গা থেকে লেখা তুলে ফেলা হল। আমি অন্য লেখালেখি নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়লাম। বৎসর দুই কেটে যাবার পর হঠাৎ লক্ষ্য করলাম মাথার গভীর গোপনে এক ধরনের যন্ত্রণা বোধ করছি। যন্ত্রণার কারণ ঠিক বুঝতে পারছি না। স্ত্রী এবং তিন কন্যাকে নিয়ে ঘুরতে বের হলাম। গারো পাহাড় দেখতে যাব, পথে ময়মনসিংহ

শহরে থামলাম। বিকেলে দেখতে গেলাম টিচার্স ট্রেনিং কলেজ। মুক্তাগাছার জমিদারের বসত বাড়ি। কলেজের শিক্ষকরা খুব আগ্রহ নিয়ে সব ঘুরে দেখালেন। রাজবাড়ির চারদিকে বিচিত্র সব গাছ। তাঁরা এইসব গাছপালা খুব আগ্রহ নিয়ে আমাকে চেনাতে লাগলেন —

"এটা এলাচি গাছ, এটা লবঙ্গ গাছ, এটা দারুচিনি গাছ।"

মাথার মধ্যে ঘুরতে লাগল, এলাচি, লবঙ্গ, দারুচিনি।

তাঁরা নিয়ে গেলেন পুকুর ঘাটে। কি সুন্দর ডিমের মত পুকুর। শ্বেত পাথরের কি চমৎকার বাঁধানো ঘাট। পানিতে পা ডুবিয়ে ঘাটে বসেছি। টিচার্স ট্রেনিং কলেজের শিল্পকলার শিক্ষক জমিদার সম্পর্কে মজার মজার গল্প বলছেন, মুগ্ধ হয়ে শুনছি —

"বুঝলেন হুমায়ূন সাহেব, এই জমিদারের তিন স্ত্রী ছিলেন। তাঁদের একজন বিষ খাইয়ে স্বামীকে হত্যার চেষ্টা করেন। জমিদার সাহেব অনেক চেষ্টা করেন বের করতে — তিনজনের ভেতর কে বিষ দিয়েছে। বের করতে পারেন না। তিনি স্ত্রীদের শাস্তির ব্যবস্থা করেন। নতুন ধরনের শাস্তি — তিন স্ত্রীকে সামনে নিয়ে তিনি বসলেন। একটা বিড়ালকে বিষ খাইয়ে তাঁদের সামনে রাখলেন। তাঁরা দেখলেন কি করে যন্ত্রণায় ছটফট করতে করতে বিড়াল মারা যায়। জমিদার স্ত্রীদের চোখের দিকে তাকিয়ে মৃদু মৃদু হাসতে লাগলেন। এই ঘটনা মাসে একবার করে ঘটতে লাগল।"

গল্প শুনে আমি মুগ্ধ। চট করে মাথায় এল — আচ্ছা এদের নিয়ে একটা লেখা লিখলে কেমন হয়? কিন্তু এদের সম্পর্কে কিছুই জানি না। কেমন ছিল তাদের জীবনচর্যা? পুরোপুরি কল্পনাকে আশ্রয় করে এগোনো কি ঠিক হবে? গবেষণা করব, এত সময় কোথায়?

কখনো যা করি না তাই করলাম, ঠিক করলাম কিছু খাটাখাটনি করব, তথ্য জোগাড় করব। ভাটি অঞ্চলের জমিদারদের জীবিত বংশধরদের অনেকের সঙ্গে যোগাযোগ করলাম — তাঁরা সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিলেন। এঁদের মধ্যে আছেন গচিয়া চৌধুরী বাড়ির সালেহ উদ্দিন চৌধুরী এবং বাজিতপুর জমিদার বাড়ির বংশধর হারুনুর রশীদ। খসড়া লেখা তৈরি হল —। পরিকল্পনা উপন্যাস লেখার। ধারাবাহিক নাটকের চিন্তা তখনো মাথায় আসেনি।

নওয়াজীশ আলি খান

এক দুপুরে টিভি থেকে টেলিফোন করলেন নওয়াজীশ আলি খান। মহা আনন্দিত। আনন্দের কারণ হচ্ছে তাঁকে টিভি থেকে সরিয়ে 'নিমকো' বা এই

জাতীয় কোন প্রতিষ্ঠানে নির্বাসিত করা হয়েছিল, তিনি আবার টিভিতে ফিরে এসেছেন। তিনি বললেন, হুমায়ূন ভাই, আসুন চা খেয়ে যান। অনেকদিন আপনার পাগলামী কথাবার্তা শুনি না। আমি তৎক্ষণাৎ তাঁকে আমার পাগালামী কথাবার্তা শোনাবার জন্যে রওনা হয়ে গেলাম। তিনি বললেন, একটা ধারাবাহিক নাটক করলে কেমন হয়?

আমি বললাম, উত্তম হয়। কিন্তু আমি তো ভাই প্রতিজ্ঞা করেছি আর ধারাবাহিক নাটকে যাব না।

'প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করবেন না?'

'জি-না।'

'প্রতিজ্ঞা করা হয় ভাঙ্গার জন্যে, এটা জানেন?'

'জানি।'

'তাহলে আসুন শুরু করা যাক।'

'আচ্ছা ঠিক আছে।'

'আপনার উপন্যাসকে ভিত্তি করে একটা ধারাবাহিক নাটক করি — বড় উপন্যাস আছে?'

'না, তবে যে কোন উপন্যাসকেই আমি টেনে রবারের মত লম্বা করতে পারব।'

'তাহলে একটা নাম দিন, এবং সিনপ্সিস লিখে দিন — আজই টিভি গাইডে যাবে।'

আমি নাম দিলাম, "আমিন ডাক্তার।" একটা সিনপ্সিসও লিখে দিলাম — সেই সিনপ্সিস এমন যে, পড়ে কেউ কিছুই বুঝবে না। বাসায় ফিরেই ধারাবাহিক নাটকের প্রথম পর্বটি লিখে ফেললাম। লেখা শেষ হল রাত তিনটার দিকে। গুলতেকিনকে পড়তে দিলাম। সে পড়ে বলল, নাটকের নাম আমিন ডাক্তার কিন্তু গল্প তো দেখা যাচ্ছে জনৈক ছোট মীর্জাকে নিয়ে। আমি বললাম, শুরুতে আমিন ডাক্তার অপ্রধান চরিত্রে থাকলেও শেষটায় ঝলসে উঠবেন। গুলতেকিন বলল, নাটক ভাল হয়েছে তবে নামটা পছন্দ হচ্ছে না। আমি বললাম, যা বোঝ না তা নিয়ে কথা বলবে না। সে বলল, পৃথিবীর সব কিছু তুমি বোঝ আর কেউ কিছু বোঝে না — এটা মনে করারও কোন কারণ দেখি না। দু'জন দু'পাশে ফিরে ঘুমুতে গেলাম।

প্রথম পান্ডুলিপি পাঠ

আমার জীবন বন্ধুহীন। মাঝে মাঝে অল্প কিছু সময়ের জন্যে দু'একজন বন্ধু-বান্ধব জোটে। তাঁদের সঙ্গে যোগাযোগ এক বছরের বেশি কখনো থাকে না। আমার তেমনি এক বন্ধু কবি ওবায়দুল ইসলাম আগ্রহ প্রকাশ করলেন যে প্রথম পান্ডুলিপি তাঁর বাসায় পাঠ হবে। সেই উপলক্ষে অনেককে নিমন্ত্রণ করা হল। নিমন্ত্রিতদের মধ্যে আছেন। আবুল খায়ের, আসাদুজ্জামান নূর, ডঃ এবং মিসেস ইনামুল হক, সপরিবারে আবুল হায়াত। আসরের মধ্যমণি হিসেবে আছেন নওয়াজীশ আলি খান। খাবার-দাবারের বিপুল আয়োজন। পান্ডুলিপি পকেটে নিয়ে সন্ধ্যার পর সেই বাসায় উপস্থিত হলাম। অতিথিরা সবাই এসে গেছেন কিন্তু তাদের সবার মুখই শুকনো। কথা বলছেন নিচু গলায়। খবর যা শুনলাম তা ভয়াবহ।। ওবায়দুল ইসলাম সাহেবের কনিষ্ঠ পুত্র খেলতে গিয়ে বাঁ চোখে প্রচণ্ড ব্যথা পেয়েছে। চোখে দেখতে পাচ্ছে না বলে বলছে। ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। ডাক্তার বলেছেন, চোখের ভেতর রক্তক্ষরণ হয়েছে। কিছুমাত্র নড়াচড়া না করে দু'সপ্তাহ একভাবে শুয়ে থাকতে হবে। ভাগ্য ভাল হলে রক্ত শরীর শুষে নেবে। ভাগ্য খারাপ হলে . . .

ছেলেটি শুয়ে আছে। নড়াচড়া করছে না। এই অবস্থায় খাওয়া-দাওয়া করা বা পান্ডুলিপি পড়ার প্রশ্নই উঠে না। আমি বললাম, আজ বাদ থাক, অন্য একদিন পড়া যাবে। নওয়াজীশ আলি খান বললেন, বাদ দিন, বাদ দিন।

গৃহকর্তা এবং গৃহকর্ত্রী রাজি হলেন না। তাঁদের বাড়ির সবাই অভিনয় কলায় বিশেষ পারদর্শী। সবাই এমন ভাব করতে লাগলেন যেন কিছুই হয়নি। চোখে আঘাত পেয়ে দেখতে না পাওয়া যেন নিত্যদিনের ব্যাপার। তাদের কারণেই খাওয়া-দাওয়া হল, পান্ডুলিপি পাঠ হল। তর্ক-বিতর্ক, মন্তব্য, রসিকতা চলতে লাগল। এক সময় বিস্মিত হয়ে লক্ষ্য করলাম — মড়ার মত পড়ে থাকা বাচ্চা ছেলেটির কথা কারোরই মনে নেই। প্রথম দিনের আলোচনায় কয়েকটি সিদ্ধান্ত নেয়া হল। আমিন ডাক্তারের ভূমিকায় অভিনয় করবেন জনাব আবুল খায়ের। নাটকটির নাম বদল করা হবে।

অভিনেতা-অভিনেত্রী নির্বাচন

নাটকের পাত্র-পাত্রী নির্বাচন সব সময় প্রযোজকই করে থাকেন। নওয়াজীশ আলি খান বললেন, নির্বাচনের ব্যাপারটি আপনাকে নিয়ে করতে চাই। এই নাটকে চরিত্র অনেক বেশি। চরিত্রের মেজাজও বিচিত্র। আপনি সঙ্গে থাকলে ভাল হবে।

আমি সঙ্গে রইলাম। দেখা গেল আমি সঙ্গে থাকায় সমস্যা কমল না, বাড়ল। পছন্দের অভিনেতা-অভিনেত্রী যাকেই নিতে চাই তিনিই না করেন। মদিনার স্বামী হিসেবে মামুনুর রশীদকে নেয়ার খুব ইচ্ছা ছিল। তিনি ভদ্রভাবে বললেন — না। মীর্জার ছোট বৌ হিসেবে খুব শখ ছিল সুবর্ণাকে নেবার। তিনি বললেন — না। তাঁর না বলার কারণ হচ্ছে, তিনি অন্য একটি ধারাবাহিক নাটক 'গ্রন্থিকগণ কহে'-তে কথা দিয়ে রেখেছেন। ডলি জহুরকেও বলা হল। তিনি বললেন — মুস্তাফিজুর রহমান সাহেবের একটি সিরিজে তাঁকে কাজ করতে হবে। শান্তা ইসলামকে মদিনার চরিত্রে ভাবা হয়েছিল, তাঁর চরিত্র পছন্দ হল না। বললেন — বিদেশ যাবেন, কাজেই করতে পারবেন না।

আমার দীর্ঘ দিনের বন্ধু জনাব আবুল হায়াত সাহেবকে যখন কাশেমের চরিত্র করতে বলা হল তখন তাঁর ফর্সা মুখ কালো হয়ে গেল। চরিত্র পছন্দ নয়। তাঁকে বাসায় গিয়ে নানান কথাবার্তায় ভোলাতে হল।

ফেরদৌসী মজুমদারকে মা চরিত্রে ভাবা হল। আমি নিজে এক দুপুরে তাঁকে পর পর তিনটি পর্ব পড়ে শোনালাম। তিনি শুকনো গলায় বললেন — এর মধ্যে অভিনয় করার কি আছে? যে কেউ এই চরিত্র করতে পারে।

সাবিহা চরিত্রে মধ্যম মানের একজন অভিনেত্রীকে ডাকা হয়েছিল (ডালিয়া)। তিনিও শুকনো মুখে জানালেন — চরিত্রে অভিনয়ের কিছু নেই।

শেষ পর্যন্ত চরিত্র ঠিক হল।

অভিনেতা অভিনেত্রীদের নাম শুনে সবাই বলল — ডুবেছে, এইবার হুমায়ূন আহমেদ ডুবেছে। বিশ বাঁও পানির নিচে পড়ে যাবে। তাদের এ-জাতীয় চিন্তার

কারণ হচ্ছে — মীর্জা চরিত্র করছেন আসাদুজ্জামান নূর। যিনি সব সময় হালকা আমোদী ধরনের চরিত্র করেন। মীর্জা চরিত্রের কাঠিন্য আনা তাঁর কর্ম নয়।

দ্বিতীয় প্রধান চরিত্র করছেন সারা যাকের। টিভি দর্শকরা যাঁকে আগে কখনো পছন্দ করেননি।

আরেকটি প্রধান চরিত্র করছেন আমজাদ হোসেন। সবার ধারণা হল, তিনি উচ্চগ্রামের অভিনয় করে নাটকে "আউলা" ভাব নিয়ে আসবেন।

হায়াত সাহেবকে নিয়েও ভয় — মাঝি চরিত্রে তাঁকে মানাবে না।

মুস্তাফিজুর রহমান আমাকে বললেন, মিসকাস্ট হয়েছে। মিসকাস্টের জন্যে সমস্যায় পড়বেন। এখনো সময় আছে নূরের জায়গায় আলি যাকেরকে নিন। বিশাল দেহ আছে, মানিয়ে যাবে।

আমি বললাম, জমিদারকে কুস্তি করতে হবে এমন তো কোন কথা নেই — দেখা যাক না

নৌকা ভাসানোর ব্যবস্থা হল। ছ'টি পান্ডুলিপি প্রস্তুত হল এবং পাঠ করা হল। একেকদিন একেক জনের বাসায়। যে বাড়িতে পাঠ করা হবে সেই বাড়ির দায়িত্ব হচ্ছে চমৎকার ডিনারের ব্যবস্থা করা। আমি পান্ডুলিপি নিয়ে বিভিন্ন বাড়িতে খেয়ে বেড়াতে লাগলাম। সে বড় সুখের সময়।

ইতিমধ্যে নাম বদল হয়েছে। এখন আর আমিন ডাক্তার নাম নয়। এখন নাম হল 'অয়োময়'।

এই অদ্ভুত নাম কোথায় পেলাম? দেশ পত্রিকায় একবার একটা কবিতা পড়েছিলাম। কবির নাম অয়োময় চট্টোপাধ্যায়। অয়োময় নামটা মাথায় গেঁথে গিয়েছিল। গাঁথুনি থেকে খুলে নিয়ে মাথা খানিকটা হালকা করলাম।

কারা কারা অভিনয় করবেন মোটামুটি ঠিক হয়ে গেল। সবাই পূর্ব-পরিচিত। তাঁদের সঙ্গে আগে কাজ করেছি — নতুনের মধ্যে আছেন মোজাম্মেল হোসেন। একদিন নওয়াজীশ আলি খানের অফিসে গিয়ে দেখি বিশালদেহী এক ভদ্রলোক বসে আছেন। নওয়াজীশ ভাই পরিচয় করিয়ে দিলেন — ইনি অধ্যাপক মোজাম্মেল হোসেন। তাঁকে মীর্জার লাঠিয়াল চরিত্রে ভাবছি।

আমি বিস্মিত হয়ে তাকালাম। অধ্যাপক মানুষ, সামান্য লাঠিয়াল চরিত্র করবেন? চরিত্রও তো তেমন কিছু না। আমি বললাম, ভাই আপনি কাশতে পারেন? তিনি তৎক্ষণাৎ খুক খুক করে দেখিয়ে দিলেন — "ফলেন পরিচয়তে।"

অয়োময়ের অল্প কিছু ব্যাপার দর্শকরা খুব আগ্রহ নিয়ে গ্রহণ করেছেন — হানিফের কাশি তার একটি। বিভিন্ন অনুষ্ঠানে তাঁকে ডাকা হয় কাশার জন্য।

শিল্পীরা অনুষ্ঠানে গান গান, নাচেন, কবিতা আবৃত্তি করেন — হানিফ সাহেব কাশেন। সেদিন শুনলাম এক ক্যাসেট কোম্পানী হানিফ সাহেবের কাশির একটা ক্যাসেট বের করতে চান। এই বিচিত্র দেশে সবই সম্ভব।

আমাদের সবচে' বড় সমস্যা হল মদিনা চরিত্রে। আমি নওয়াজীশ ভাইকে বলে দিয়েছিলাম — পাগলের থাকবে অল্পবয়স্কা রূপবতী এক বালিকা বধু। যে মেয়েকে নেয়া হল তার নাম মনে পড়ছে না — সে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলার ছাত্রী। চরিত্রের জন্যে মানানসই। একদিন রিহার্সেল দিয়ে সে পিছিয়ে পড়ল। জানাল — নাটক করবে না। শান্তাকে ভাবা হল। তিনিও পিছিয়ে পড়লেন — দেখা গেল এই চরিত্র কারোরই পছন্দ নয়। একটা সমস্যায় পড়া গেল।

আহমেদ ছফা তখন এক মহিলাকে পাঠালেন যদি তাঁকে কোন সুযোগ দেয়া যায়। তাঁর সঙ্গে কথা বলে আমার ধারণা হল, তিনি পারবেন। আমি তাঁকে নিয়ে টিভি ভবনে গেলাম। ভদ্র মহিলা বললেন, হুমায়ূন ভাই যেহেতু আপনি আমাকে নিয়ে যাচ্ছেন আমার একটি চরিত্র পাওয়া অবশ্যই উচিত কিন্তু আমার সিক্সথ সেন্স অত্যন্ত প্রবল। আমি জানি এই নাটকে অভিনয় করতে পারব না।

ভদ্রমহিলা রিহার্সেলে অংশগ্রহণ করলেন। কন্ট্রাক্ট ফরমে সই করলেন। আমি তাঁকে হাসিমুখে বললাম, দেখলেন তো আপনার সিক্সথ সেন্স খুব প্রবল নয়।

তিনি আনন্দিত গলায় বললেন, তাই তো দেখছি কিন্তু আমি জানি আমার দ্বারা হবে না। বিশ্বাস করুন আমার সিক্সথ সেন্স অত্যন্ত প্রবল।

আমি অবাক হয়ে দেখলাম, ভদ্রমহিলার কথাই শেষ পর্যন্ত সত্য হল। তাঁকে নেয়া হল না। কেন নেয়া হল না তা তাঁকে বলা উচিত ছিল। বলিনি। আজ এই লেখার মাধ্যমে তাঁর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করছি এবং স্বীকার করছি তাঁর ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় আসলে ভাল।

মদিনা চরিত্রে শেষ পর্যন্ত এলেন — তারানা। আমি সব সময় তাঁর অভিনয়ের ভক্ত। কৃষ্ণব্রীহি নাটকে তাঁকে নেয়ার খুব আগ্রহ ছিল। তিনি রাজি হননি। এইবার রাজি হলেন।

অয়োময় হবে না

সব যখন ঠিকঠাক তখন বাংলাদেশ টেলিভিশনের পক্ষ থেকে নওয়াজীশ আলি খান আমাকে জানালেন, অয়োময় করা সম্ভব হচ্ছে না। আমি আকাশ থেকে পড়লাম। অনেক কষ্টে নিজেকে সামলে নিয়ে বললাম, কারণ কি?

তিনি করুণ গলায় বললেন, কারণ খুব সহজ। টিভির অনেক সীমাবদ্ধতা আছে। এই নাটক যা দাবি করছে টিভির পক্ষে তা মেটানো সম্ভব নয়। হাতি, ঘোড়া, ছিপ নৌকা, হাওড়ে দিনরাত শুটিং — অসম্ভব। এই একটি ধারাবাহিকের জন্যে টিভির পক্ষে বিশেষ কোন ব্যবস্থা করাও সম্ভব নয়। কাজেই বাতিল।

আমি মন খারাপ করে বাসায় বসে রইলাম। আমাকে আরেকটি সহজ নাটক লিখে দেবার জন্যে মুস্তাফিজুর রহমান অনুরোধ করলেন। আমি বালকদের মত অভিমানী গলায় বললাম — 'না।'

আমি যখন পুরোপুরি নিশ্চিত যে নাটক হবে না, তখন একদিন নওয়াজীশ আলি খান বললেন — সুসংবাদ। টিভি এই নাটকের জন্যে কিছু বিশেষ সুযোগ-সুবিধা দিতে রাজি হয়েছে তবে আপনাকেও আপনার পরিকল্পনার খানিকটা কাটছাট করতে হবে। রাজি থাকলে চলুন নৌকা ভাসিয়ে দেই।

আমি বললাম — রাজি। খুশি মনে বাসায় ফিরে এসেছি। গুলতেকিনকে বললাম, অয়োময় শেষ পর্যন্ত যাচ্ছে —। সে ফ্যাকাশে ভঙ্গিতে হাসল। রাতে ঘুমুতে যাবার আগে বলল, আচ্ছা আমি যদি তোমাকে কোন অনুরোধ করি তুমি রাখবে?

আমি বললাম, 'অবশ্যই রাখব। কি চাও তুমি?'

'নাটকটি তুমি এক বছর পিছিয়ে দাও।'

'সে কি? কেন?'

'আমি বেবি এক্সপেক্ট করছি। এই অবস্থায় টেনশান নেয়া আমার পক্ষে সম্ভব না। আমি তোমার নাড়ি-নক্ষত্র চিনি। নাটক শুরু হওয়া মাত্র তুমি জগৎ-সংসার ভুলে যাবে। সব সামলাতে হবে আমাকে। আমার পক্ষে তা সম্ভব না। আমি তোমাকে অনুরোধ করছি একটা বৎসর পিছিয়ে দাও।'

আমি বললাম, তা তো সম্ভব না। পাশার দান ফেলা হয়ে গেছে, খেলা শুরু হয়েছে। তুমি কোন চিন্তা করবে না। তোমাকে কোন টেনশান নিতে হবে না — সব টেনশান আমি নেব।

গুলতেকিনের কথা না শোনার জন্যে পরবর্তী সময়ে আমাকে চরম মূল্য দিতে হল। সেই গল্প একটু পরেই বলব।

অয়োময়ের গান

গান লিখব কখনো ভাবিনি। আমার সব সময় মনে হয়েছে গীতিকার হবার প্রথম শর্ত সুর, রাগ-রাগিনীর উপর দখল। সেই দখল আমার একেবারেই নেই। কাজেই গান লেখার প্রশ্নই ওঠে না। কিন্তু গান তো লাগবেই। ভাটি অঞ্চলের মানুষ ছ'মাস বসে থাকে। সেই সময়ের বড় অংশ তারা গান-বাজনা করে কাটায়। অয়োময় ভাটি অঞ্চলের গল্প। গান ছাড়া চলবে না। প্রথমে ভেবেছিলাম সেই অঞ্চলের প্রচলিত গীত ব্যবহার করব। সংগ্রহ করা গেল না। শেষটায় বিরক্ত হয়ে নিজেই লিখতে বসলাম। সুর দেবার জন্যে ওমর ফারুককে দেয়া হল — তিনি চোখ কপালে তুলে বললেন, আপনার লেখা?

আমি চাপা অহংকার নিয়ে বললাম, জ্বি।

ওমর ফারুক বিরক্ত গলায় বললেন, গান লেখার তো আপনি কিছুই জানেন না। মিল কোথায়? সঞ্চারী কোথায়?

'সঞ্চারী কোথায় আমি জানি না। কিন্তু মিল তো আছে।'

'এই মিলে চলবে না।'

আমি নরম স্বরে বললাম, কি করে গান লিখতে হয় আপনি শিখিয়ে দিন। আমি দ্রুত শিখতে পারি।

ওমর ফারুক সাহেব শিখিয়ে দিলেন। তাঁর মত করে গান লিখে দিলাম। তিনি সুর দিয়ে আমাকে শোনালেন। আমি অবিকল তাঁর মত চোখ কপালে তুলে বললাম, কি সুর দিয়েছেন? শুনতে জঘন্য লাগছে।

'কি বললেন, শুনতে জঘন্য লাগছে?'

'জ্বি।'

এই রকম কথা বলতে পারলেন?'

'আমি মনে কথা রাখতে পারি না। যা মনে আসে বলে ফেলি।'

'হুমায়ূন সাহেব, আপনার সঙ্গে আমি কাজ করব না। স্লামালিকুম।'

'ওয়ালাইকুম সালাম।'

উনি এক দরজা দিয়ে বের হচ্ছেন, আমি অন্য দরজা দিয়ে। নওয়াজীশ ভাই দু'জনকে ধরে এনে মিটমাট করার চেষ্টা করলেন।

ওমর ফারুক সাহেব রাগে কাঁপতে কাঁপতে বললেন, হুমায়ূন সাহেব, গানগুলি প্রচার হোক, তখন আপনি বলবেন — ওমর ফারুক দি গ্রেট।

গান প্রচার হল। এ-দেশের মানুষ গানগুলি ভালবাসার সঙ্গে গ্রহণ করলেন। আমি বলতে বাধ্য হলাম — ওমর ফারুক দি গ্রেট।

অয়োময়ের সব ক'টি গান আমার লেখা নয়। একটি লিখেছেন সালেহ চৌধুরী — আল্লাহ সবুর করলাম সার। অন্য আরেকটি ওবায়দুল ইসলাম — আসমান ভাইঙ্গা জোছনা পড়ে।

অয়োময়ের গানগুলির মধ্যে আমার সবচে' প্রিয় গান হচ্ছে "আমার মরণ চাঁদনী পহর রাইতে যেন হয়।" আসলেই আমি চাঁদনী পহর রাতের ফকফকা জ্যোৎস্নায় মরতে চাই। মৃত্যুর ঠিক আগের মুহূর্তেও অসহ্য সুন্দর পৃথিবীকে দেখে যেতে চাই। লেখাটা মনে হয় অন্য দিকে মোড় নিয়ে নিচ্ছে — আগের জায়গায় ফিরে যাই।

যাত্রা শুরু

আউট ডোর-এর কাজ হবে ময়মনসিংহে। ব্রহ্মপুত্র নদী, আমিন ডাক্তার নৌকায় করে ভাটি অঞ্চলে যাচ্ছেন — সারাদিন নৌকা চলেছে। এক সময় রাত নামল। আকাশে চাঁদ উঠল। বদরুল গান শুরু করল —

"আসমানে উইঠাছে চাঁন্দি
আমি বসিয়া কান্দি
ভব সমুদ্র একা একা ক্যামনে হব পার?"

দৃশ্যটি ধারণ করতে গিয়ে ক্যামেরাম্যান নজরুল সাহেব হিমশিম খেয়ে গেলেন। নদীতে প্রবল স্রোত। নৌকা টালমাটাল করছে। নেমেছে বৃষ্টি। ময়মনসিংহের বিখ্যাত বৃষ্টি একবার শুরু হলে থামার নাম করে না।

রাত তখন একটা। গানের দৃশ্যের চিতায়া শুরু হয়েছে। আমি উৎসাহদাতা হিসেবে অন্য একটি নৌকায় আমাদের আর্ট ডাইরেক্টরের সঙ্গে বসে আছি। হঠাৎ প্রবল স্রোতে নৌকা এগিয়ে চলল। মূল দলের সঙ্গে বিচ্ছিন্ন হয়ে আমরা ভেসে যেতে লাগলাম। ঘোর অন্ধকার। কিছুই দেখা যাচ্ছে না — দূর থেকে ভেসে আসছে বদরুলের গলা (সুবীর নন্দী) "ভব সমুদ্র একা একা ক্যামনে হব পার।"

আমার জীবনের আনন্দময় মুহূর্তের একটি। আবেগে চোখে পানি এসে গেল। কয়েক ফোঁটা চোখের জল রেখে এলাম ব্রহ্মপুত্র নদীতে।

শুটিং শেষ হল রাত দু'টার দিকে। উৎসাহের কারো কোন কমতি নেই। ভোর হওয়ামাত্র আবার বের হয়ে পড়লাম। রাজবাড়িতে সেট পড়েছে। পুকুর ঘাটে বড় বৌ এবং এলাচি বেগম। সারাদিন কাজ হল — সবার মনে প্রবল উৎসাহ। যে করেই হোক একটা ভাল জিনিস করতে হবে। যে কোন মূল্যে করতে হবে। আশেপাশের সবাই সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিলেন।

কত সুখস্মৃতি

অয়োময় নিয়ে চমৎকার সব স্মৃতি আছে। কয়েকটা বলি — মির্জা সাহেব খবর পেলেন তাঁর সন্তান হবে। মনের আনন্দে তিনি সব পাখি ছেড়ে দেবার সিদ্ধান্ত নিলেন। ক্যামেরা তাঁর মুখের উপর ধরা। তাঁর মুখ আনন্দে উজ্জ্বল। তিনি পাখির খাঁচায় হাত ঢুকাচ্ছেন আর পাখিরা তাঁকে প্রাণপণ শক্তিতে ঠোকরাচ্ছে। হাত রক্তাক্ত। মীর্জা সাহেব ব্যথায় চিৎকার করতে পারছেন না — আবার পাখি জোগাড় করা সমস্যা। ছবি নেয়া শেষ হল। তিনি রক্তাক্ত হাত চেপে ধরে চেঁচাতে লাগলেন — বাবা রে মা'রে গেলাম রে।

নাপিত নিবারণকে পাগল তাড়া করছে — নিবারণ ছুটছে। এক সময় সে বুকে হাত দিয়ে বসে গেল। নাওয়াজীশ আলি খান ছুটে গেলেন। নির্ঘাৎ হার্ট এ্যাটাক। নিবারণ-রূপী এ,বি সিদ্দিক ছটফট করছেন, তাঁকে হাওয়া করা হচ্ছে, মাথায় পানি ঢালা হচ্ছে। আমি একটু দূরে মাথায় হাত দিয়ে বসে আছি। নওয়াজীশ ভাইয়ের মুখ ছাই বর্ণ। মোবারক উচ্চস্বরে কলেমা শাহাদৎ পড়ছে।

দারোগা সাহেব ঘোড়ায় করে এসেছেন — কাশেমকে গ্রেফতার করে নিয়ে যাবেন। ঘোড়ার পেছনে একদল গ্রামবাসী। গ্রামবাসীর ভূমিকায় অভিনয় করার জন্যে এক যুবক এগিয়ে এল, সে রীতিমত পাংক। মাথা কামানো — মাঝখানে এক চিলতে চুল। নওয়াজীশ আলি খানের মেজাজ গেল বিগড়ে। তিনি তাকে নেবেন না। ছেলে অভিনয় করবেই। শেষ পর্যন্ত রাগে ক্ষিপ্ত হয়ে বললেন, ঠিক আছে তুমি আস ঘোড়ার পেছনে পেছনে। ছেলে দু'পা এগুতেই ঘোড়া প্রচণ্ড লাথি দিয়ে ছেলেকে শুইয়ে দিল। আমরা বললাম — সাবাস ঘোড়া। পাংকবিহীন দৃশ্য ধারণ করা হল।

দুঃখময় স্মৃতি

আমার সব ধারাবাহিক নাটকে যা হয় — একদল মানুষ ক্ষেপে যান। এবারো তার ব্যতিক্রম হল না। আমাকে নারী-বিদ্বেষী হিসেবে দেখানো হল। কঠিন সব চিঠি ছাপা হল — একটি লিখলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জনৈকা অধ্যাপিকা। একটি সংলাপে মীর্জার মা'র চরিত্রে রূপদানকারী মিসেস দিলারা জামানও আপত্তি করলেন। সংলাপটি হচ্ছে,

"ঢোল, পশু ও নারী — এদের সব সময় মারের উপর রাখতে হয়।"

সংলাপটি দেয়ার উদ্দেশ্য সমাজে সেই সময়ের নারীর অবস্থান বোঝানো। আজ এই কথা কেউ বলবে না, কিন্তু তখন বলতো। ময়মনসিংহের একটি প্রবচন হচ্ছে, "জরু ও গরুকে মারের উপর রাখতে হয়।" তারো আগে যদি যাই তাহলে দেখি রামায়ণেও এই উক্তি আছে। তুলসীদাসের রামচরিত মানসে লেখা —

ঢোল, গঁবার, শুদ্র ,পশু, নারী — এদের মারের উপর রাখতে হয়।

আমি এ-জাতীয় সংলাপ ব্যবহার করছি বলেই এটা আমার মনের কথা তা মনে করার কোনই কারণ নেই। বহুব্রীহিতে এমদাদ খোন্দকার বলতেন, মেয়েছেলের পড়াশোনার কোনই দরকার নাই — তারা থাকবে রান্নাঘরে।" এটা এমদাদ খোন্দকারের কথা। আমার না। অথচ শিক্ষিত লোকজন ভেবে বসলেন, প্রচণ্ড নারী-বিদ্বেষ নিয়ে আমি অয়োময় লিখছি। কি অসম্ভব কথা!

ধর্মপ্রাণ মুসলমানদের এক অংশ তিন তালাকের একটি দৃশ্যেও খুব আহত হলেন। আমি দেখিয়েছিলাম রাগের মাথায় তিনবার তালাক বললেই তালাক হয় না। তাঁরা বললেন — হয়। অথচ আমি খুব ভালমত জেনেশুনেই নাটকে এই দৃশ্য ব্যবহার করেছি। ইসলামিক পারিবারিক আইনেও বলা আছে — পর পর তিনবার তালাক বললেই তালাক হবে না। এই আইন বড় বড় আলেমদের সাহায্যে হাদিস কোরআন ঘেঁটে তৈরি করা। আমার বিপক্ষে কঠিন কঠিন সব চিঠি একের পর এক ছাপা হতে লাগল। হায়, একজন কেউ আমার পক্ষে একটি কথা বললেন না।

শেষ কথা

রচনাটি দীর্ঘ হয়ে যাচ্ছে। এখন শেষ করা উচিত। সুন্দর কিছু কথা বলে শেষ করলে ভাল হত — অন্য ধরনের কিছু কথা দিয়ে শেষ করি —

নাটকের চতুর্থ পর্ব প্রচারের পর আমার স্ত্রী একটি অসম্ভব রূপবান ছেলের জন্ম দিলেন। ছেলেটি দু'দিন বেঁচে রইল — তৃতীয় দিনের দিন মারা গেল। শোক ও দুঃখে পাথর হয়ে যাওয়া স্ত্রীকে নিয়ে ঘরে ফিরেছি। বাচ্চারা চিৎকার করে কাঁদছে। আমার মা'কে ঘুমের অষুধ দিয়ে ঘুম পাড়িয়ে রাখা হয়েছে। আর আমি কি করছি – – মাথা নিচু করে লিখে যাচ্ছি অয়োময়ের নবম, দশম পর্ব। আমি দু'দিন পর আমেরিকা চলে যাব। আমাকে পান্ডুলিপি দিয়ে যেতে হবে। নাটক যেন বন্ধ না হয় — "Show must go on."

লিখতে লিখতে হঠাৎ কি মনে হল। বিছানায় শুয়ে থাকা স্ত্রীর দিকে তাকালাম। দেখি সে জলভরা চোখে আমার দিকে তাকিয়ে আছে। হয়ত ভাবছে, এই পাষাণ-হৃদয় মানুষটির সঙ্গে আমার বিয়ে হল?

আমি তার পাশে গিয়ে বসলাম না। মাথায় হাত রাখলাম না। সান্ত্বনার কথাও কিছু বললাম না। আমার হাতে সময় নেই। আমার কাজ শেষ করতে হবে —

"I have promises to keep
And miles to go before I sleep
And miles to go beore I sleep."

একদিন আমার সব কাজ শেষ হবে। চাঁদনী পহর রাতে মৃত্যুর জন্যে প্রস্তুত হব। তখন এ জীবনে সঞ্চিত সমস্ত ব্যথার কথা ভেবে চিৎকার করে কাঁদব। আজ আমার কাঁদার অবসর নেই। I have promises to keep.

ভদ্রলোক কঠিন গলায় বললেন, আপনি কি সেই লেখক?

আমি 'হ্যাঁ' বলব না 'না' বলব বুঝতে পারলাম না। সেই 'লেখক' বলতে ভদ্রলোক কি বোঝাতে চাচ্ছেন কে জানে? তিনি যে আমার সঙ্গে রসালাপ করতে আসেননি তা বুঝতে পারছি। সাপের চোখের মত কঠিন চোখে তাকাচ্ছেন। চোখে পলক পড়ছে না।

ভদ্রলোক চেয়ারে বসতে বসতে বললেন, ঘরে কি বাংলা অভিধান আছে? আমি বিনীত ভঙ্গিতে বললাম, জ্বি আছে।

ঃ নিয়ে আসুন।

পাগল টাইপ মানুষদের বেশী ঘাটাতে নেই — আমি অভিধান নিয়ে এলাম। ভদ্রলোক বললেন, আপনার একটি উপন্যাসে গণ্ডগ্রাম শব্দটা পেয়েছি। গণ্ডগ্রাম শব্দের মানে কি বলুন।

ঃ গণ্ডগ্রাম হচ্ছে অজ পাড়া গাঁ।

ঃ অভিধান খুলে দেখুন।

অভিধান খুললাম। অভিধানে লেখা — গণ্ডগ্রাম হচ্ছে বড় গ্রাম, প্রধান গ্রাম, বর্ধিষ্ণুগ্রাম। কি সর্বনাশের কথা।

ভদ্রলোক চিবিয়ে চিবিয়ে বললেন, বাংলা না জেনে বাংলা লিখতে যান কেন? আগে তো ভাষাটা শিখবেন, তারপর গল্প উপন্যাস লিখবেন।

ভদ্রলোক আরো একগাদা কথা শুনিয়ে বিদেয় হলেন। আমি সঙ্গে সঙ্গে আমার এক অধ্যাপক বন্ধুকে টেলিফোন করলাম। বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের অধ্যাপক। আমি বললাম, অভিধান না দেখে বলুনতো গণ্ডগ্রাম মানে কি? অধ্যাপক বন্ধু বললেন, গণ্ডগ্রাম মানে অজ পাড়া গাঁ। ছোট্ট ক্ষুদ্র গ্রাম।

দয়া করে অভিধান দেখে বলুন।

ঃ অভিধান দেখার দরকার নেই।

ঃ দরকার না থাকলেও দেখুন।

অধ্যাপক বন্ধু অভিধান দেখলেন। বেশ কয়েকটাই বোধ হয় দেখলেন। কারণ টেলিফোনে কথা বলতে তাঁর অনেক সময় লাগল।

ঃ অভিধান দেখেছেন?

ঃ হুঁ।

ঃ ব্যাপারটা কি বলুনতো? আপনি ভুল না অভিধান ভুল?

ঃ অভিধানও ঠিক আছে। আমিও ঠিক আছি।

ঃ তার মানে?

ঃ গণ্ডগ্রাম শব্দটির আসল মানে বড় গ্রাম, প্রধান গ্রাম কিন্তু সবাই ভুল করে অজ পাড়া গাঁ অর্থে গণ্ডগ্রাম ব্যবহার করতে থাকল। আজ তাই অজ পাড়া গাঁ হচ্ছে স্বীকৃত অর্থ। এটাই শুদ্ধ।

ঃ অভিধান তা হলে বদলাতে হবে?

ঃ তাতো হবেই। ভাষা কোন স্থির কিছু নয়। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে এটা বদলাতে পারে। শব্দের অর্থ পাল্টে যেতে পারে।

অধ্যাপক বন্ধুর কথা আমাকে খানিকটা ধাঁধায় ফেলে দিলেও ঠাণ্ডা মাথায় চিন্তা করে দেখলাম তিনি খুব ভুল বলেননি। কিছু কিছু শব্দের অর্থ সময়ের সঙ্গে সঙ্গে সত্যি পাল্টে যাচ্ছে। যতই দিন যাচ্ছে ততই উল্টো অর্থ হচ্ছে। যেমন ধরুন — — বুদ্ধিজীবী। অভিধানিক অর্থ হচ্ছে — বুদ্ধি বলে বা বুদ্ধির কাজ দ্বারা জীবিকা অর্জনকারী।

আজ বুদ্ধিজীবী শব্দের অর্থ কি দাঁড়িয়েছে? আজ বুদ্ধিজীবী শব্দটি গালাগালি অর্থে ব্যবহৃত হচ্ছে। বুদ্ধিজীবী বলতে আমরা বুঝি নাকউঁচু সুবিধাবাদী একদল মানুষ যাদের প্রধান কাজ হচ্ছে বিবৃতি দেয়া।

আমার এক বন্ধু কিছুদিন আগে বলছিলেন — দেশে কত রকম আন্দোলন হয়। আন্দোলনে ছাত্র মরে, শ্রমিক মরে, টোকাই মরে কিন্তু কখনো কোন বুদ্ধিজীবী মরে না। ছলে বলে কৌশলে তারা বেঁচে থাকে। কারণ তারা মরে গেলে বিবৃতি দেবে কে? শিল্প, সাহিত্য, সংস্কৃতির দেখ-ভাল করবে কে? সভা-সমিতিতে প্রধান অতিথি, বিশেষ অতিথি হবে কে?

আমার লেখার ভঙ্গি দেখে কেউ কেউ মনে করে বসতে পারেন —আমি বিবৃতি দেয়াটাকে খুব সহজ কাজ ধরে নিয়ে ব্যাপারটাকে ছোট করতে চাচ্ছি। মোটেই তা না। আমি এ দেশের একজন বুদ্ধিজীবীর বিবৃতিতে সই করার সময়ের কিছু অন্তরঙ্গ মুহূর্ত দেখেছি — আমি জানি কাজটা কত কঠিন।

বিবৃতিতে সই করার সময় একজন বুদ্ধিজীবীকে কত দিকেই না খেয়াল করতে হয়। প্রথমেই দেখতে হয় তার আগে কারা কারা সই করেছে। যারা সই করেছে তাদের ব্যাকগ্রাউণ্ড কি? প্রো চায়না, প্রো রাশিয়া না কি আমেরিকা পন্থী? তারপর চিন্তা করতে হয় বিবৃতিতে সই করলে সরকারী লোকজন ক্ষেপে যাবে কি-না, সই না করলে পাবলিক ক্ষেপবে কি-না।

এ ছাড়াও সমস্যা আছে — খবরের কাগজে তার নাম ঠিকমত ছাপা হবে তো? সিনিয়ারিটি মেইনটেইন করা হবে তো। তাঁর আগে কোন চেংড়ার নাম চলে যাবে না তো?

আমি লক্ষ্য করে দেখেছি বুদ্ধিজীবীরা বড়ই সাবধানী। তাঁরা কাউকেই রাগাতে চান না। নিজেরাও রাগেন না। তাঁদের মুখের হাসি হাসি ভাবটা থেকেই যায়। তাঁরা এই অসম্ভব কি করে সম্ভব করেন কে জানে।

মূল বিষয় থেকে দূরে সরে যাচ্ছি। শুরু করেছিলাম শব্দের অর্থ সময়ের সঙ্গে সঙ্গে কি ভাবে বদলায় তার উপর গুরু গম্ভীর আলোচনা দিয়ে। সেখানেই ফিরে যাই। অর্থ বদলে যাচ্ছে এমন কিছু শব্দ আমি বের করেছি — ঠিক আছে কি-না

দেখুনতো —

	প্রাচীন অর্থ	বর্তমান অর্থ	ভবিষ্যৎ অর্থ
ছাত্র ঃ	শিক্ষার্থী (যে শিক্ষা গ্রহণ করে)	যে শিক্ষা দেয়	?
নেতা ঃ	পথ প্রদর্শক (অগ্রে চলেন যিনি)	পথ দেখানোর দায়িত্ব এড়াবার জন্যে পশ্চাতে চলেন যিনি।	?

না, এ লেখাটা বড় শুকনো ধরণের হয়ে যাচ্ছে। বুঝতে পারছি পাঠকরা ইতিমধ্যেই যথেষ্ট বিরক্ত হয়েছেন। কি করব বলুন, মাঝে মাঝে ঠাট্টা মশকরা কিছুতেই আসতে চায় না। নিজের উপর, নিজের চারপাশের জগতের উপর প্রচণ্ড রাগ হয়। সেই রাগ গুছিয়ে প্রকাশ করতে পারি না তখন ইচ্ছা করে . . . . . .

থাক ইচ্ছার কথা। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একটা গল্প বলে শেষ করি। শোনা গল্প। সত্য মিথ্যার দায়–দায়িত্ব নিচ্ছি না।

হার্টজগ তখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর। হরপ্রাসাদ শাস্ত্রী বাংলার অধ্যাপক। তিনি রিডার (সহযোগী অধ্যাপক) পদে একজন শিক্ষকের নিয়োগ দিতে চাইলেন। হার্টজগ বললেন, একজন রিডার না নিয়ে দু'জন লেকচারার নিন।

হরপ্রাসাদ বললেন, তা হলে একটা গল্প শুনুন। এক লম্পট সাহেবের অভ্যাস ছিল প্রতিরাতে ষোলবছর বয়েসী তরুণীর সঙ্গে নিশিযাপন। নিত্য নতুন ষোল বছর বয়েসী তরুণী জোগাড় করার দায়িত্ব ছিল বাড়ির খানসামার। এক রাতে সে মুখ কাচুমাচু করে বলল, ষোল বছর তো পাওয়া গেল না স্যার। আটবছর বয়সের দু'জন নিয়ে এসেছি। আটে আটে ষোল হয়ে গেল।

হরপ্রাসাদ শাস্ত্রী গল্পের এই পর্যায়ে হঠাৎ নীচুগলায় বললেন, মিঃ হার্টজগ আশা করি বুঝতে পারছেন, একজন ষোল বছরের কাছ থেকে যা পাওয়া যাবে দু'জন আট বছরের কাছ থেকে তা পাওয়া যাবে না।

হার্টজগ কোন কথা না বলে তৎক্ষণাৎ লিখিত হুকুম দিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগে একজন রিডার (সহযোগী অধ্যাপক) নিয়োগ করা হোক।

আজকের এলেবেলে এই পর্যন্ত থাক। আজ কেন জানি কোন কিছুই জমছে না।

অনেক বক বক করা হল। এবার একটি গল্প দিয়ে শেষ করি। গল্পটি 'ফজলুল করিম সাহেবের ত্রাণকার্য" নামে এক অখ্যাত পত্রিকায় ছাপা হয়েছিল কারণ বিখ্যাত পত্রিকার কোন সম্পাদক এটা ছাপতে রাজি হননি। কেন রাজি হননি সেই বিবেচনার ভার পাঠকদের উপর ছেড়ে দিচ্ছি।

ফজলুল করিম সাহেব গম্ভীর মুখে বললেন, 'মাঝে মাঝে বড় ধরনের ক্যালামিটির প্রয়োজন আছে। বন্যার খুব দরকার ছিল।' এই বলেই তিনি পানের পিক ফেলে কড়া করে তাকালেন ইয়াজুদ্দিনের দিকে। ইয়াজুদ্দিন ভয়ে কুঁচকে গেল।

'পানে কি জর্দা দেয়া ছিল ইয়াজুদ্দিন?'

ইয়াজুদ্দিন হ্যাঁ না কিছুই বলল না। ফজলুল করিম সাহেব দ্বিতীয়বার পানের পিক ফেলে বললেন, 'তোমরা কোন কাজ ঠিকমত করতে পার না। আমি কি জর্দা খাই?'

'আরেকটা পান নিয়ে আসি স্যার?'

ফজলুল করিম জবাব দিলেন না! তাঁর মাথা ঘুরছে। বমি-বমি ভাব হচ্ছে। এই সঙ্গে ক্ষীণ সন্দেহও হচ্ছে যে, ইয়াজুদ্দিন নামের বোকা বোকা ধরনের এই লোকটা ইচ্ছে করে তাঁকে জর্দাভর্তি পান দিয়েছে। এরা কেউ তাঁকে সহ্য করতে পারে না। পদে পদে চেষ্টা করে ঝামেলায় ফেলতে। ইয়াজুদ্দিনের উচিত ছিল ছুটে গিয়ে পান নিয়ে আসা। তা না করে সে ক্যাবলার মত জিজ্ঞেস করছে — আরেকটা পান নিয়ে আসি স্যার। হারামজাদা আর কাকে বলে।

তিনি বিরক্ত মুখে বললেন, 'রিলিফের মালপত্র সব উঠেছে?'

রোগা লম্বামত এক ছোকরা বলল, 'ইয়েস স্যার।' ছোকরার চোখে সানগ্লাস। সানগ্লাস চোখে দিয়ে একজন মন্ত্রীর সঙ্গে কথা বলা চূড়ান্ত অভদ্রতা — এটা কি এই

ছোকরা জানে? অবশ্যি পুরোপুরি মন্ত্রী তিনি নন, প্রতিমন্ত্রী। মন্ত্রীদের দলের হরিজন। তিনি যখন কোথাও যান তাঁর সঙ্গে টিভি ক্যামেরা থাকে না। বক্তৃতা দিলে খবরের কাগজে সবসময় সেটা ছাপাও হয় না। কাজেই এই ছোকরা যে সানগ্লাস পরে তাঁর সঙ্গে কথা বলবে এতে অবাক হবার কিছু নেই। তবু তিনি বললেন,

'আপনার চোখে সানগ্লাস কেন?'

'চোখ উঠেছে স্যার।'

ছোকরা সানগ্লাস খুলে ফেলল। তিনি আঁতকে উঠলেন . . .ভয়াবহ অবস্থা। তাঁর ধারণা ছিল চোখ-উঠা রোগ দেশ থেকে বিদেয় হয়েছে। এখন দেখা যাচ্ছে পুরোপুরি বিদেয় হয়নি। এই ছোকরার কাছ থেকে হয়ত তাঁর হবে। এখনি কেমন যেন চোখ কড় কড় করছে। তিনি বিরক্ত মুখে বললেন, 'আমরা অপেক্ষা করছি কি জন্যে?'

'সারেং এখনো আসেনি।'

'আসেনি কেন?'

'বুঝতে পারছি না স্যার। ন'টার সময় তো আসার কথা।'

তিনি ঘড়ি দেখলেন এগারোটা কুড়ি বাজে। তাঁর এগারোটার সময় উপস্থিত হবার কথা ছিল। তিনি কাঁটায় কাঁটায় এগারোটায় এসেছেন। অথচ তাঁর পি.এ এসেছে এগারটা দশে। প্রতিমন্ত্রী হবার এই যন্ত্রণা।

'ডেকে চেয়ার আছে স্যার। ডেকে বসে বিশ্রাম করুন। সারেংকে আনতে লোক গেছে।'

তিনি অপ্রসন্ন মুখে ডেকে রাখা গদিওয়ালা বেতের চেয়ারে বসলেন। সামনে আরো কিছু খালি চেয়ার আছে কিন্তু তাঁর সঙ্গের কেউ সেই সব চেয়ারে বসল না। তিনি দরাজ গলায় বললেন, 'দাঁড়িয়ে আছেন কেন? বসুন। কতক্ষণে লঞ্চ ছাড়বে কোন ঠিক নেই। বাংলাদেশ হচ্ছে এমনই একটা দেশ যে সময়মত কিছু হয় না।'

'বন্যাটা অবশ্যি স্যার সময়মত আসে।'

তিনি অপ্রসন্ন মুখে তাকালেন। কথাটা বলেছে সানগ্লাস পরা ছোকরা। কথার পিঠে কথা ভালই বলেছে। তিনি নিজে তা পারেন না। চমৎকার কিছু কথা তাঁর মনে আসে ঠিকই কিন্তু তা কথাবার্তা শেষ হবার অনেক পরে। তিনি চশমা পরা ছোকরার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'আপনি কে? আপনাকে তো ঠিক চিনতে পারছি না।'

'আমার নাম স্যার জামিল। নিউ ভিডিও লাইফে কাজ করি। আমি স্যার ত্রাণকার্যের ভিডিও করব।'

'ত্রাণকার্যের ভিডিও করবেন মানে? ত্রাণকার্যের ভিডিও করতে আপনাকে বলেছে কে?'

'আমাকে স্যার একদিনের জন্যে ভাড়া করা হয়েছে।'

'আপনি নেমে যান।'

'জ্বি স্যার।'

'আপনাকে নেমে যেতে বলছি। ত্রাণকার্যের ভিডিও করার কোন প্রয়োজন নেই।'

'স্যার হামিদ সাহেব বললেন . . .'

'হামিদ সাহেব বললে তো হবে না। আমি কি বলছি সেটা হচ্ছে কথা। যান

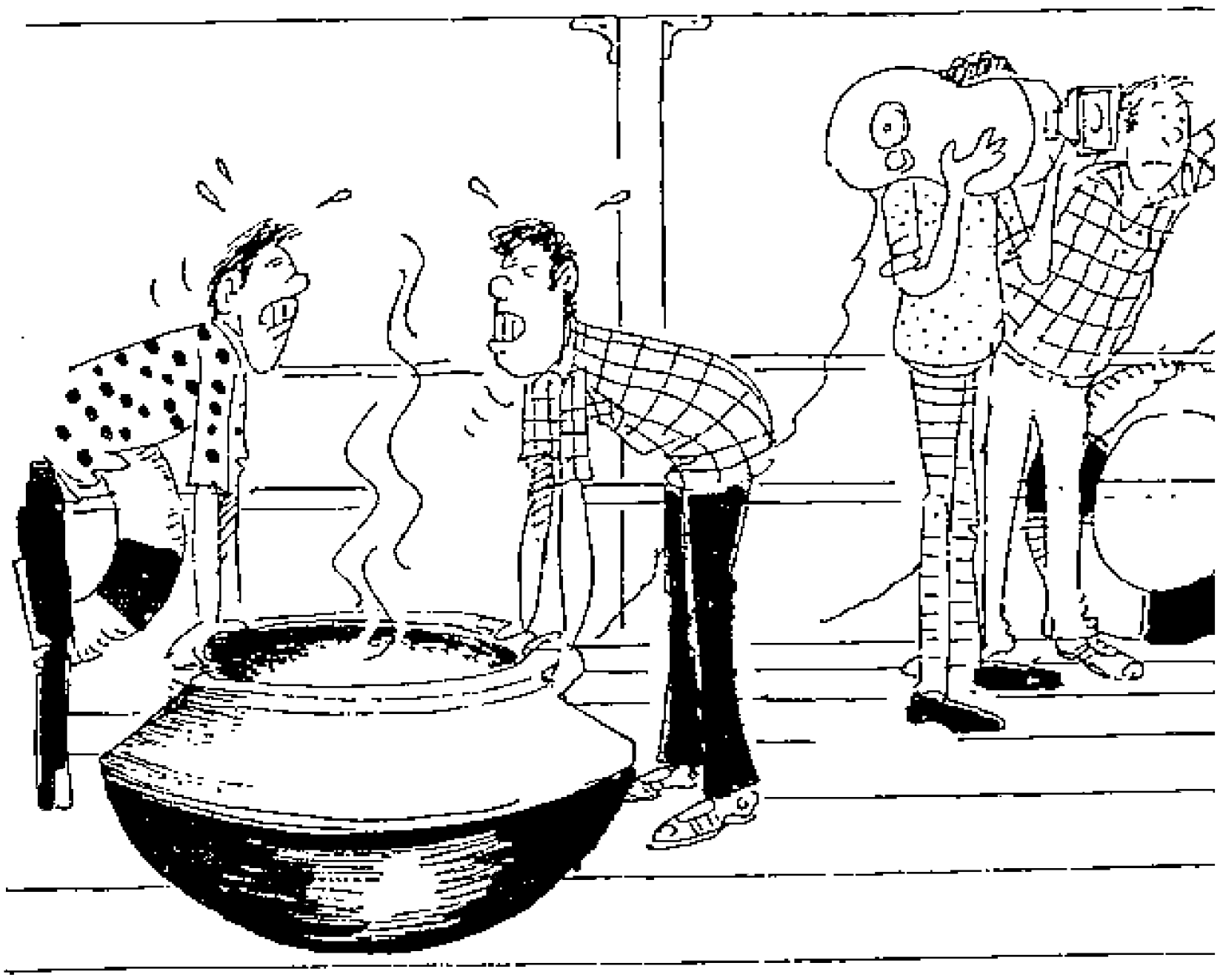

নেমে যান।'

জামিল লঞ্চের ডেক থেকে নীচে নেমে গেল। ফজলুল করিম সাহেব থমথমে গলায় বললেন — জনগণকে সাহায্য করবার জন্যে যাচ্ছি। এটা কোন বিয়েবাড়ির দৃশ্য না যে ভিডিও করতে হবে। কি বলেন আপনারা?

একজন বলল — স্যার ঠিকই বলেছেন। খাজনার চেয়ে বাজনা বেশি হয়ে যাচ্ছে। সাহায্য যা দেয়া হচ্ছে তার চেয়ে ছবি বেশী তোলা হচ্ছে। টিভি খুললেই দেখা যায় . . .

তিনি তাকে কথা শেষ করতে দিলেন না। কড়া গলায় বললেন — লঞ্চের সারেং-এর খোঁজ পাওয়া গেল কি-না দেখেন। আমরা রওনা হব কখন আর ফিরবই বা কখন? এত মিস ম্যানেজমেন্ট কেন?

দুপুর বারোটা পর্যন্ত লঞ্চের সারেং-এর খোঁজ পাওয়া গেল না। তার বাসা কল্যাণপুরে। পুরো বাড়ি পানিতে তলিয়ে যাওয়ায় তার পরিবার-পরিজনকে খোঁজে পাওয়া যাচ্ছে না — এরকম একটা খবর পাওয়া গেল। ফজলুল করিম সাহেবের বিরক্তির সীমা রইল না। এত মিস ম্যানেজমেন্ট। কেউ কোন দায়িত্ব পালন করছে না।

লঞ্চ একটা দশ মিনিটে ছাড়ল। অন্য একজন সারেং জোগাড় করা হয়েছে।

ফজলুল করিম সাহেব বলে দিয়েছেন ইনটেরিয়রের দিকে যেতে হবে। এমন জায়গা যেখানে এখনো সাহায্য পৌঁছেনি। তাঁরা হবেন প্রথম ত্রাণদল।

'প্রথম দিকে এ রকম হচ্ছে — একই লোক তিন চারবার করে সাহায্য পাচ্ছে, আবার কেউ কেউ এখন পর্যন্ত কিছু পায়নি। তবে অবস্থাটা সাময়িক। কিছুদিনের মধ্যে খুবই প্ল্যানড ওয়েতে ত্রাণকার্য শুরু হবে। আমার সরকারের তাই ইচ্ছা। কি বলেন হামিদ সাহেব?'

'তা তো ঠিকই স্যার। জার্মানরা যখন প্রথম রাশিয়া আক্রমণ করল তখন কি রকম কনফিউশন ছিল রাশিয়াতে। টোটেল হচপচ। কে কি করবে, কার দায়িত্ব কি — কিছুই জানে না। এখানেও একই অবস্থা।'

ফজলুল করিম সাহেব কিছুই বললেন না। তাঁর এই পি.এ-র স্বভাব হচ্ছে বড় বড় কথা বলা। বুঝিয়ে দেয়া যে, সে নিজে প্রচুর পড়াশোনা জানা লোক। সে ছাড়া বাকি সবাই মূর্খ।

'স্যার চা খাবেন? ফ্লাস্কে চা এনেছি।'

'না।'

'খান স্যার, ভাল লাগবে।'

তাঁর চায়ের পিপাসা ছিল কিন্তু তিনি চা খেলেন না। ডেকের খোলা হাওয়ায় আরাম করে চা খেতে খেতে যাওয়ার চিন্তাটাই অস্বস্তিকর। তিনি সিগারেট ধরাতে ধরাতে বললেন, এতো দেখি সমুদ্র।

'সমুদ্র তো বটেই স্যার। বাতাস নেই, আরামে যাচ্ছি। বাতাস দিলে — ছয় সাত ফুট ঢেউ হয়।'

'সেকি!'

'একটা ত্রাণলঞ্চ ডুবে গেল। আর ছোটখাট নৌকা তো কতই ডুবছে।'

'বলেন কি! নতুন সারেং কেমন?'

'লঞ্চ ডুবার ভয় নেই স্যার। স্টিল বডি লঞ্চ। নতুন ইঞ্জিন।'

'আমরা যাচ্ছি কোথায়?'

'সেটা তো স্যার এখনো ঠিক হয়নি।'

'কি বলছেন এসব? চোখ বন্ধ করে চলতে থাকবে নাকি?'

ব্যাপার অনেকটা তাই স্যার। উত্তর-দক্ষিণ-পূর্ব-পশ্চিম সব দিকেই পানি। এখন কম্পাস ছাড়া গতি নেই।"

'ডেস্টিনেশন তো লাগবে?'

'অফকোর্স স্যার। আমি সারেংকে বলে দিয়েছি ঘন্টা খানিক নদী ধরে সোজাসুজি যাবে, তারপর কোন একটা শুকনো জায়গা দেখলে . . . শুকনো জায়গা মানেই আশ্রয় শিবির।'

'আগে দেখতে হবে ওরা সাহায্য পেয়েছে কি-না। তেলা মাথায় তেল দেয়ার মানে হয় না।'

'তা তো বটেই স্যার।'

'ত্রাণ সামগ্রীর লিস্ট কার কাছে?'

'আমার কাছে।'

'কি কি নিয়ে যাচ্ছি আমরা?'

হামিদ সাহেব ফাইল খুলে লিস্ট বের করলেন।

'বায়ান্নটা তাঁবু . . . '

'তাঁবু? তাঁবু কি জন্যে? তাঁবু আপনি কি মনে করে আনলেন? এটা মরুভূমি নাকি?'

'মরুভূমির দেশ থেকে আসা সাহায্য আমরা স্যার কি করব বলুন। তাঁবু ছাড়াও আরো জিনিস আছে। এক হাজার কৌটা কনসানট্রেটেড টমেটো জুস।'

'বলেন কি? কনসানট্রেটেড টমেটো জুস দিয়ে ওরা কি করবে?'

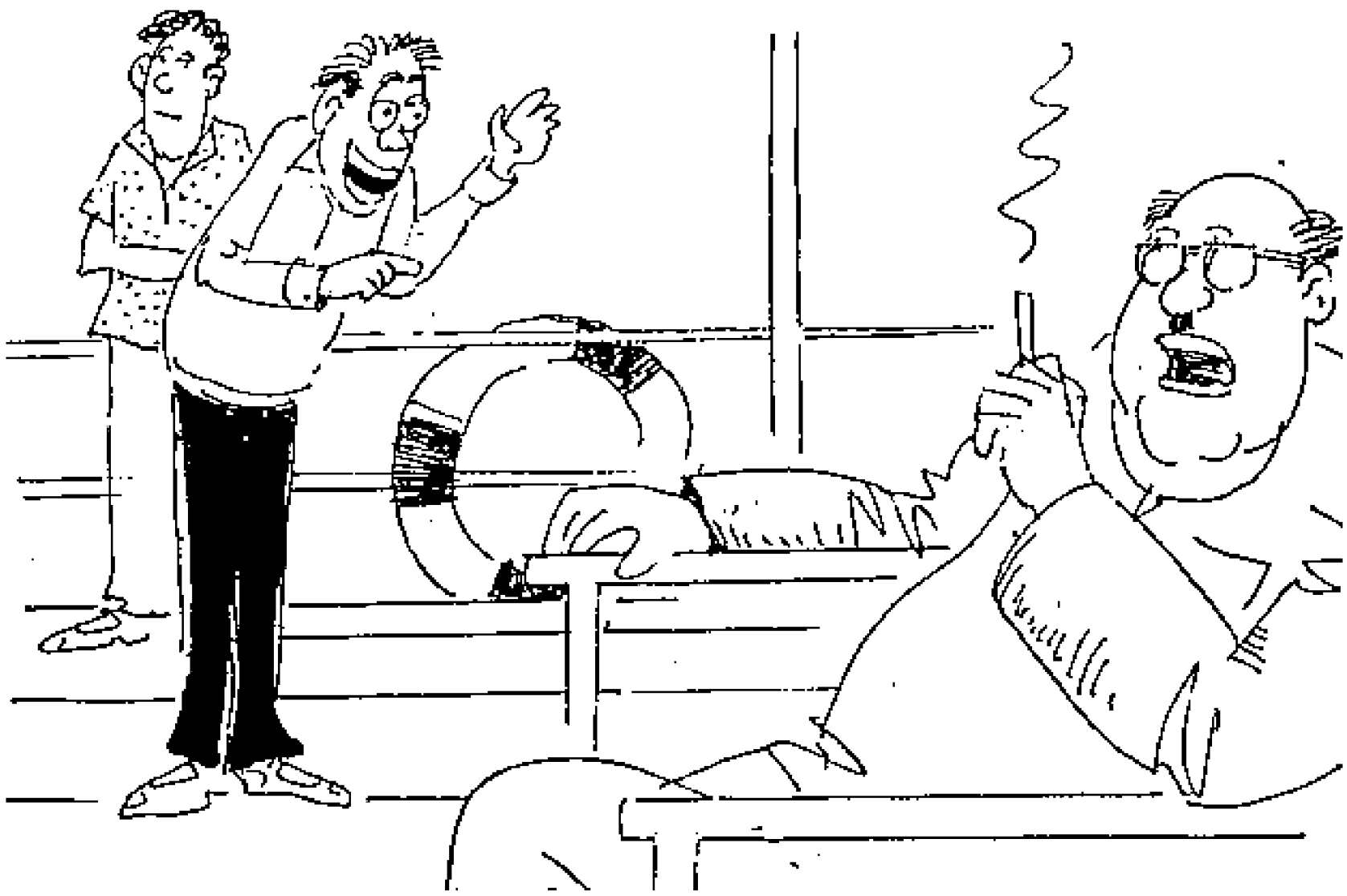

'ইরাকের সাহায্য স্যার। গত বছরে বন্যার জন্যে দিয়েছিল। গুদামে থেকে পচে গেছে বলে মনে হয়। কৌটা খুললেই ভক করে একটা গন্ধ আসে।'

'আর কি আছে?'

'পাঁচশ' বোতল ডিস্টিল ওয়াটার। এক একটা বোতল দু'লিটারের।'

'ডিস্টিল ওয়াটার দিয়ে কি করবে?'

'বুঝতে পারছি না স্যার। মনে হচ্ছে মেডিক্যাল সাপ্লাই, বরিক কটন আছে দুই পেটি।'

'এই সব সাহায্য নিয়ে উপস্থিত হলে তো আমার মনে হয় মার খেতে হবে।'

'তা তো হবেই। বেশ কিছু ত্রাণ পার্টি মার খেয়ে ভূত হয়েছে। কাপড়-চোপড় খুলে নেংটা করে ছেড়ে দিয়েছে।'

'আপনি আমার সঙ্গে রসিকতা করছেন?'

'জ্বি না স্যার, সত্যি কথা বলছি। একটা পার্টি খুব সম্ভব শিক্ষক সমিতি — শিশু শিক্ষা বই, খাতা, পেনসিল এইসব নিয়ে গিয়েছিল। তাদের এই অবস্থা হয়েছিল।'

ফজলুল করিম সাহেব খুবই গম্ভীর হয়ে গেলেন। হামিদ সাহেব বললেন, আমাদের এই ভয় নেই। রান্না করা খাবারও তো নিয়ে যাচ্ছি।

'কি খাবার?'

'খাবার হচ্ছে খিচুড়ি। প্রায় তিনশ' লোকের ব্যবস্থা। তারপর লুঙ্গি, গামছা, শাড়ি এসবও আছে। ক্যাশ টাকা আছে।'

'ক্যাশ টাকা কত?'

'প্রায় পাঁচ হাজার।'

'প্রায়? প্রায় কি জন্যে? এগজেক্ট ফিগার বলুন।'

'পাঁচ হাজার ছিল, তার মধ্যে কিছু খরচ হয়ে গেল। ভিডিও ক্যামেরা, তারপর আপনার নতুন সারেং নিতে হল। এই খরচা বাদ যাবে।'

'ভিডিও ক্যামেরা আপনাকে কে নিতে বলল?'

'এটা তো স্যার বলার অপেক্ষা রাখে না। একটা রেকর্ড থাকতে হবে না?'

ফজলুল করিম সাহেব আর কিছু বললেন না। ঝিম মেরে বসে রইলেন। চারিদিকে পানি আর পানি। নদী দিয়ে নৌকা চলছে না সমুদ্র পাড়ি দেয়া হচ্ছে বোঝার কোন উপায় নেই। আকাশ কেমন ঘোলাটে। অল্প অল্প বাতাস দিচ্ছে। তাতেই বড় বড় ঢেউ তৈরী হচ্ছে। লঞ্চের গায়ে বেশ শব্দ করে ঢেউ ভেঙ্গে পড়ছে। আরো বড় ঢেউ উঠতে শুরু করলে মুশকিল।

দু'ঘণ্টা চলার পরও কোন শুকনো জায়গা দেখা গেল না। লঞ্চের সারেং চোখ-মুখ কুঁচকে জানাল, নদী-বরাবর গেলে শুকনো জায়গা চোখে পড়বে না। আড়াআড়ি যেতে হবে। তবে সে আড়াআড়ি যেতে চায় না। লঞ্চ আটকে যেতে পারে। আড়াআড়ি যেতে হলে নৌকা নিয়ে যাওয়া উচিত।

ফজলুল করিম সাহেবের বিরক্তির সীমা রইল না। তিনি বিড় বিড় করে বললেন — মিস ম্যানেজমেন্ট। বিরাট মিস ম্যানেজমেন্ট। এই ব্যাপারগুলো আগেই দেখা উচিত ছিল।

হামিদ সাহেব হালকা গলায় বললেন, আগে তো স্যার বুঝতে পারিনি। আপনি কিছু মুখে দিন স্যার, সারাদিন খাননি। চা আর নোনতা বিসকিট দেই? কলাও আছে। স্যার দিতে বলি?

'আপনারা কিছু খেয়েছেন? চারটা তো প্রায় বাজে।'

'খিচুড়ি নিয়ে বসেছিল সবাই। খেতে পারেনি। টক হয়ে গেছে।'

'টক হয়ে গেছে মানে?'

'সকাল সাতটার সময় রান্না হয়েছে, এখন বাজছে চারটা — গরমটাও পড়েছে ভ্যাপসা। এই গরমে মানুষ টক হয়ে যায় আর খিচুড়ি।'

লঞ্চ মাঝ-নদী কিংবা মাঝ-সমুদ্রে থেমে আছে। ফজলুল করিম সাহেব বিমর্ষ মুখে নোনতা বিসকিট এবং চা খাচ্ছেন। এক ফাঁকে লক্ষ্য করলেন ভিডিওর জামিল ছোকরা লঞ্চেই আছে, নেমে যায়নি। পানির ছবি তুলছে। হারামজাদাকে ঘাড়ে ধাক্কা দিয়ে পানিতে ফেলে দিতে পারলে একটু ভাল লাগত, তা সম্ভব না।

নদীতে নৌকা, লঞ্চ একবারেই চলাচল করছে না। দুপুর বেলার দিকে কিছু কিছু ছিল এখন তাও নেই। হামিদ সাহেব শুকনো গলায় বললেন — কি করব স্যার? ফিরে চলে যাব?

ফজলুল করিম সাহেব জবাব দিলেন না। হামিদ সাহেব থেমে থেমে বললেন, সন্ধ্যা পর্যন্ত নদীতে থাকা ঠিক হবে না স্যার, ডাকাতের উপদ্রব। খুবই ডাকাতি হচ্ছে। ফিরে যাওয়াই ভাল। দিনের অবস্থা খারাপ। ভাদ্র মাসে ঝড়-বৃষ্টি হয়।

'আশ্বিন মাসে ঝড় হয় বলে জানতাম। ভাদ্র মাসের কথা এই প্রথম শুনলাম।'

'আবহাওয়া তো স্যার চেঞ্জ হয়ে গেছে। এখন তাহলে কি রওনা হব?'

ফজলুল করিম সাহেব চুপ করে রইলেন। বন্যার পানি দেখতে লাগলেন। হামিদ সাহেব বললেন, খিচুড়ি ফেলে দিতে বলেছি। টক খিচুড়ি ফিরিয়ে নিয়ে গিয়ে তো লাভ নেই। যে খাবে তারই পেট নেমে যাবে।

'যা ইচ্ছা করুন। কানের কাছে বক বক করবেন না।'

'পাঁচ হাজার টাকা ক্যাশ আছে বলেছিলাম না, তাও ঠিক না। লঞ্চের তেলের খরচ দিতে হয়েছে। সারেং এবং তার দুই এ্যাসিসটেন্টের বেতন, ভিডিও ভাড়া, চা, নোনতা বিসকিট এবং কলার জন্যে খরচ হল চার হাজার সাতান্ন টাকা তেত্রিশ পয়সা। সঙ্গে এখন স্যার ক্যাশ আছে নয় শ' বিয়াল্লিশ টাকা সাতষট্টি পয়সা।'

'আমার কানের কাছে দয়া করে ভ্যান ভ্যান করবেন না।'

লঞ্চ ফিরে চলল। পথে কলাগাছের ভেলায় ভাসমান একটি পরিবারকে পাওয়া গেল। তিন বাচ্চা, বাবা-মা, একটি ছাগল এবং চারটা হাঁস। অনেক ডাকাডাকির পর তারা লঞ্চের পাশে এনে ভেলা ভিড়াল। নয় শ' বিয়াল্লিশ টাকা সাতষট্টি পয়সার সবটাই তাদেরকে দেয়া হল। একটা শাড়ি, একটা লুঙ্গি এবং একটা গামছা দেয়া হল। ফজলুল করিম সাহেব দরাজ গলায় বললেন — একটা তাঁবু দিয়ে দিন। হামিদ সাহেব ক্ষীণ গলায় বললেন, তাঁবু দিয়ে ওরা কি করবে?

'যা ইচ্ছা করুক। আপনাকে দিতে বলছি দিন।'

'তাঁবুর ভারে ভেলা ডুবে যাবে স্যার।'

'ডুববে না।'

তারা তাঁবু নিতে রাজি হল না। তার বদলে ভেলা থেকে লঞ্চে উঠে এল। এগারো-বারো বছরের একটি মেয়ে আছে সঙ্গে। সে সারাদিনের ধকলের কারণেই বোধ হয় লঞ্চে উঠে হড়হড় করে বমি করল। ফজলুল করিম সাহেব আঁৎকে উঠে বললেন, কলেরা না-কি? কি সর্বনাশ। তাঁর মেজাজ খুবই খারাপ হয়ে গেল। তিনি বাকি সময়টা কেবিনে দরজা আটকে বসে রইলেন। তাঁর গায়ের তাপমাত্রা বেড়ে গেল। হড় হড় শব্দে বমি করে ফেললেন।

পরদিনের খবরের কাগজে ফজলুল করিম সাহেবের ত্রাণকার্যের একটি বিবরণ ছাপা হয় — অত্যন্ত প্রতিকূল অবস্থায় জনশক্তি দপ্তরের প্রতিমন্ত্রী জনাব ফজলুল করিম একটি ত্রাণদল পরিচালনা করে বন্যা মোকাবেলায় বর্তমান সরকারের অঙ্গীকারকেই স্পষ্ট করে তুলেন। দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়ায় পুরো চব্বিশ ঘণ্টা অমানুষিক পরিশ্রম করে তিনি নিজেই অসুস্থ হয়ে বর্তমানে মেডিক্যাল কলেজে চিকিৎসাধীন। জনশক্তি মন্ত্রী জনাব এখলাস উদ্দিন হাসপাতালে তাঁকে মাল্যভূষিত করে বলেন — বর্তমান পরিস্থিতিতে আমাদের ফজলুল করিম সাহেবের মত মানুষ দরকার। পরের জন্যে যাঁরা নিজের জীবন উৎসর্গ করতে পিছপা নন। এই প্রসঙ্গে তিনি রবি ঠাকুরের একটি কবিতার চরণও আবেগজড়িত কণ্ঠে আবৃত্তি করেন — "কেবা আগে প্রাণ করিবেক দান, তার লাগি কাড়াকাড়ি।"